প্রথম প্রকাশ
১লা বৈশাখ, ১৩৪১

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিন্টার্স
১৩৮ বিধান সরণী
কলকাতা-৪

প্রচ্ছদশিল্পী
সুব্রত চৌধুরী

মূল্য : বার টাকা

শ্রীপার্থ সেন
প্রীতিভাজনেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই—

মেমসাহেব
ডিপ্লোম্যাট
এ-ডি-সি
রিপোর্টার
ডিফেন্স কলোনী
রাজধানীর নেপথ্যে
ভি-আই-পি
যৌবন নিকুঞ্জে
তোমাকে
আকাশ ভরা সূর্যতারা
পার্লামেন্ট স্ট্রীট
উইং কমাণ্ডার
ওয়ান আপ-টু ডাউন
ক্যাম্পাস
ককটেল
এবং
হরেকৃষ্ণ জুয়েলার্স
অনুরোধের আসর
হকার্স কর্নার
প্রবেশ নিষেধ
গোধুলিয়া
লাস্ট কাউণ্টার
কেরাণী
ব্যাচেলার
শেষ পারানির কড়ি
নাচনী
ভায়া ডালহৌসী
কেয়ার অব ইণ্ডিয়ান এম্বাসী
সেলিম চিস্তি
রিটায়ার্ড
মনে মনে
বন্যা
প্রিয়বরেষু
জার্নালিস্টের জার্নাল
রাজধানী এক্সপ্রেস
শ্রেষ্ঠ গল্প
অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান
অ্যালবাম
সোনালী
মোগলসরাই জংশন
ভালোবাসা
পেন ফ্রেণ্ড অ্যাণ্ড ক্লাশ ফ্রেণ্ড
ইওর অনার
পিকাডিলী সার্কাস
ডার্লিং
রবিবার
সাব ইন্সপেক্টর
নিমন্ত্রণ
ম্যাডাম
ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র
ইনকিলাব
বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত
ইমন কল্যাণ
ম্যারেজ রেজিস্ট্রার
অন্য দিন
চিড়িয়াখানা
পথের শেষে
ভদ্দরলোক

এক

সাইলেন্স !

পরিচালকের চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই নিউ বেঙ্গল স্টুডিও'র দু'নম্বর ফ্লোরের সব গুঞ্জন থেমে গেল।

লাইটস্ অন্ !

সাউণ্ড !

দু' নম্বর সহকারী পরিচালক বাঁদরের মত এক লাফে ক্যামেরার সামনে হাজির হয়ে ক্ল্যাপস্টিক ধরে বেশ চড়া গলায় বললেন—সীন থ্রী, বাট্ ওয়ান, টেক টু।

খটাস !

ক্ল্যাপস্টিকের মাথার কাঠ ঠুকে আওয়াজ করেই দু'নম্বর সহকারী পরিচালক আবার এক লাফে স্যুটিং জোনের বাইরে চলে গেলেন।

ক্যামেরা ম্যান মিড লং শট্ নিতে শুরু করলেই দেখা যায়—বসন্তবাবু একটা সুন্দর বেতের চেয়ারে বসে খবরের কাগজের প্রথম পাতা পড়ছেন। সামনের সেণ্টার টেবিলে এক পেয়ালা চা। পাশেই এক প্যাকেট ডানহিল আর ইলেকট্রনিক লাইটার। ভদ্রলোক মধ্য-বয়সী হলেও সুদর্শন। পরনে পায়জামা পাঞ্জাবি। এক কথায় দেখেই মনে হয় বেশ সুখী, এবং সচ্ছল। বারান্দার ওপাশ থেকে ওর স্ত্রী কমলা হাতে এক কাপ চা নিয়ে স্বামীর কাছে আসছেন। কমলার যৌবন চলে গেলেও সৌন্দর্য ও মাধুর্য দুইই আছে। দুটো চোখে এখনও মাদকতা, পরনে প্রিন্টেড শাড়ি ও সাদা স্লিভলেস ব্লাউজ। সরু চেনের সঙ্গে ঝোলানো লকেটটা যেখানে লুটোপুটি খাচ্ছে সেখানে সব পুরুষের চোখ পড়বেই।

মিড শট্—কমলা স্বামীর পাশের খালি চেয়ারে বসেই চায়ে চুমুক দেন। সেণ্টার টেবিলে কাপ নামিয়ে রেখে স্বামীকে বলেন, ভিতরের পাতাটা দাও।

বসন্ত মুখ না তুলেই বলেন, কী আর পড়বে? একটাও ভাল খবর নেই।

এবার ক্লোজ শটে কমলাকে চায়ের কাপে চুমুক দিয়েই হাসতে দেখা যায়। বলেন খবরের কাগজ না পড়লে জানব কিভাবে আজ কর্পোরেশনের জল পাব কিনা।

মিড শট্।

বসন্ত হাসেন।

কমলা আবার হেসে বলেন, তাছাড়া দেখি, আবার কোন স্বামী তার স্ত্রীকে মার্ডার করল।

এসব খবরও পড়ছ?

পড়ব না? কমলার মুখে গর্বের হাসি। বলেন, আজকাল তুমি এত ড্রিঙ্ক করে ফিরছ যে কবে কী করো, তা কী বলা যায়?

বসন্ত একবার কমলার সর্বাঙ্গের উপর দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে একটু হেসে বলেন, এমন কোন পুরুষ জন্মেছে যে তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করবে না?

কেন? আমি কী মার্লিন মনরো না লিজ টেলর?

বসন্ত কমলার কানের কাছে মুখ নিয়ে একটু চাপা গলায় বলেন, সুন্দরী, তুমি হেলেন অব ট্রয়। তুমি শুধু পুরুষদের জ্বালাতে জানো।

আঃ! সারা রাত ঘুমোবার পরও কী তোমার নেশা কাটেনি?

না।

চুপ করো। কেউ শুনে ফেলবে।

[illegible]লা উঠেছে?

আজকাল এত সকালে [illegible]?

বসন্ত শুধু হাসেন।

কমলা একটু গম্ভীর হয়েই বলেন, তুমি বেরুবার আগে মেয়েকে বলো, রোজ রোজ ইউনিভার্সিটি থেকে ফেরার সময়······

সুমন্ত আর দেবব্রত কী রোজ আসে ?

কেউ না কেউ রোজই আসে।

মেয়ে রাস্তা ঘাটে আড্ডা না দিয়ে যদি বাড়িতে বসে গল্প···

তাই বলে অত হাসাহাসি ইয়ার্কি ফাজলামি······

বসন্ত হাসতে হাসতে বলেন, সর্বত্রই কমিউনিকেশন গ্যাপ !

যেদিন দেখবে মেয়ে আর ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরল না, সেদিন বুঝবে।

বসন্ত মাথা নেড়ে বলেন, তোমার মেয়ে অত কাঁচা কাণ্ড করবে না।

কমলা উঠে দাঁড়ান।

সঙ্গে সঙ্গে পরিচালক চিৎকার করেন, কাট !

দুই

বালিগঞ্জ গার্ডেন্স‌এর এই বসন্তবাবুর পুরো নাম শ্রীবসন্তরঞ্জন সরকার। আদি নিবাস বর্ধমান জেলায় কাটোয়া মহকুমায় এক গণ্ডগ্রাম। পিতার নাম স্বর্গীয়······

স্বর্গীয় ?

হ্যাঁ স্বর্গে না গেলেও বলতে হবে স্বর্গীয় প্রিয়দারঞ্জন সরকার। স্বয়ং রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার স্যার আশুতোষ মুখার্জীর আমলে সসম্মানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ পাস করে শিক্ষকতা করেছেন সারা জীবন। এখনও নবভারত পাঠশালার হেড মাস্টার মশাইয়ের ঘরে তাঁর ছবি ঝুলছে। তবে ড্যাম্প আর উইপোকায় ছবিটার বেশ ক্ষতি হয়েছে। তবু প্রিয়দাবাবুর ফটো ছবিটা দেখেই চিনতে পারে—এ ছবিটা আমাদের প্রিয়দাবাবুর না ?

এখানকার হেড মাস্টার মশাই বলেন, হ্যাঁ। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করেন, আপনি বুঝি ওঁর ছাত্র?

হ্যাঁ।

শিক্ষক হিসেবে প্রিয়দাবাবুর খ্যাতি ছিল ছাত্র মহলে। কর্তৃপক্ষদের মধ্যেও ওর সুনাম ছিল। সে সুনামের কারণ সবাই না জানলেও বসন্তবাবু জানেন। প্রিয়দাবাবু যখন হেড মাস্টার তখন স্কুল কমিটির কেষ্টবিষ্টুর ছেলেদের খাতায় নম্বর বাড়িয়ে দিতেন এবং এ কাজটি তিনি গভীর রাত্রে নিজের ঘরে বসেই করতেন। পরে স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকদের বলতেন, কিছু কিছু খাতার নম্বর যোগ করতে ভুল করেছেন।

তাই নাকি?

হ্যাঁ; যাক আমি ঠিক করে দিয়েছি।

এই ক'দিনের মধ্যে এত খাতা দেখতে হয় যে……

তা তো বটেই। তাছাড়া এ ধরনের ভুল ইউনিভার্সিটিতেও হয় বলেই তো ট্যাবুলেটর হেড একজামিনার থাকেন।

ঠিক বলেছেন স্যার! প্রিয়দাবাবুর ছাত্র ও বর্তমানে এই স্কুলেরই শিক্ষক অশোক ঘোষাল বলেন।

প্রিয়দাবাবু অসৎ ছিলেন না কিন্তু অন্যান্য অনেক শিক্ষকের মতই পুত্রের লেখাপড়ার কাগজ পেন্সিল স্কুল থেকে আনতেন।

যাকগে সেসব।

বসন্তরঞ্জন সরকার এখন মিঃ বি. সরকার বলেই পরিচিত। ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা বসন্ত বলেই ডাকে। অফিসের অন্যান্য অফিসাররা অবশ্য শুধু সরকার বা বি. এস. বলে।

এম. এ. বি. টি পাস হেড মাস্টারের ছেলে হলেও বসন্তবাবু সাধারণ গ্রাজুয়েট। বি. এস-সি। তাও পাস কোর্সে। পিতার স্বপ্ন ছিল পুত্রও তাঁরই অনুগমন করে কলেজে অধ্যাপনা বা স্কুলে শিক্ষকতা

দাও, দাও। চার-পাঁচ বোতল বিয়ার না খেয়ে কবে বাড়ি ফিরি ?

রোজ চার পাঁচ বোতল……

মিত্তির হেসে বলেন, ভুলে যাও কেন, আমি সেল্‌স ডিরেক্টরের পি. এ ? ডিস্ট্রীবিউটার-এজেন্টরা আমায় নিত্য সেবা না করালে ওদের বারোটা বাজিয়ে দেব না ?

বসন্ত দন্ত বিকশিত করে বলে. তা ঠিক।

ভুলে যেও না, আমাদের ছত্রিশ কোটি টাকার মাল বিক্রি করে ওরা কমসে কম ন' কোটি টাকা লাভ করে।

মিত্তির চোখ দুটো বড় বড় করে বলে, সে তো বটেই ; আমরা তো সাপ্লায়ারদেরই পেমেণ্ট করি কুড়ি কোটি।

মিত্তির মাথা দোলাতে দোলাতে বলেন, ঐ কুড়ি কোটি টাকার মাল কেনার জন্য ডিরেক্টর থেকে শুরু করে তোমরা পর্যন্ত কী কম কয়দা লুঠছো।

এবার বসন্ত হেসে ফেলেন। বলেন, আমরা তো চুনোপুঁটি !

লুটের ভাগ রুই কাতলা থেকে চুনোপুঁটি—সবাই পায়, তা কী আমি জানি না ?

এবার বসন্ত আত্মসমর্পণ করে, অস্বীকার করব না, মাসে মাসে দু' পাঁচশো আমাদেরও জুটে যায়।

মিত্তির নিজেই আরো দু'বোতল বিয়ারের অর্ডার দিয়ে বললেন, ছাখো বসন্ত, ঘুষখোর বলে ইনকামট্যাক্স, সেল্‌স ট্যাক্স রেল আর পুলিশের লোকেরা সব সময় গালাগালি খায় কিন্তু পাবলিক তো জানতে পারে না ওদের হাজার গুণ ঘুষ আমরা খাই।

ঠিক বলেছেন।

ওরে বাপু, এই মিত্তির যা বলে ঠিকই বলে। আঠারো বছর বয়স থেকে প্রাইভেট ফার্মে কাজ করছি। আর এখন আমি ফিফটি-থ্রী। প্রাইভেট কোম্পানীতে কোথায় কী রস আছে, তা এই শর্মা ভাল করেই জানে।

তা তো বটেই।

আকণ্ঠ বিয়ার পান করে বার থেকে বেরুবার আগে মিত্তির বসন্তর কাঁধে হাত রেখে বললেন, ভায়া, জীবনে কোনদিন প্রাইভেট ফার্ম ছাড়া চাকরি করো না। আর প্রাইভেট ফার্মের অন্য কোন ডিপার্ট-মেণ্টে না—শুধু পারচেজ বা সেল্‌স-এ কাজ করো।

বসন্ত দাঁত বের করে হাসেন।

হাসির কথা নয় ভায়া। যা বললাম মনে রেখো।

বুক দুরুদুরু করলেও বসন্ত রবিবার সকালে মিঃ রায়ের আলি-পুরের বাড়িতে হাজির হয়েছিল কিন্তু বিস্মিত হয়েছিল ওর অমায়িক ও আন্তরিক ব্যবহারে।

প্রণাম করে ফুল আর মিষ্টি দিতেই উনি হেসে বললেন, তুমিও জেনেছ আজ আমার জন্মদিন!

বসন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মুখ নীচু করে হাসে।

মিঃ রায় চেয়ারে বসেই বললেন, বসো।

না স্যার, ঠিক আছে। বসন্ত মনে মনে ভাবে, আপনি যে আমাকে সামনে দাঁড়াতে দিয়েছেন, সেটাই আমার পরম সৌভাগ্য।

মিঃ রায় আবার হেসে বলেন, ওহে, এটা অফিস না, এটা আমার বাড়ি। বসো, বসো।

তবু বসন্তর দ্বিধা হয়। বলেন, না স্যার, দাঁড়িয়েই ঠিক আছি।

বসো, বসো; কিছু মনে করব না' তাছাড়া তুমি তো আমার ছেলের মত।

এতক্ষণ মুখ নীচু করে থাকলেও এবার বসন্ত মুখ তুলে ওর দিকে তাকান' আর! কী প্রশান্ত হাসি! একটু দ্বিধা হলেও ভয় করে না। আস্তে আস্তে পাশের চেয়ারে বসেন।

চাকর চা-মিষ্টি দিয়ে যায়।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মিঃ রায় বললেন, তোমরা তো জানো

না এক কালে আমি কত গরীব ছিলাম। সকাল-বিকেল ছাত্র পড়িয়েই এম. এস-সি পর্যন্ত পড়ি।

বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে বসন্ত ওর কথা শোনেন।

হঠাৎ মিঃ রায় একটু হাসেন। মুহূর্তের জন্য কি যেন ভাবেন। তারপর বলেন, বাবার দেনা শোধ করতে হবে বলেই জাহাজের খালাসী হয়ে আমেরিকা চলে গেলাম। প্রথম বছর খানেক কি কষ্ট করেছি, তা ভাবতে পারবে না।

মিত্তিরের কাছে একটু একটু শুনেছি স্যার।

আবার মিঃ রায় হাসেন। বলেন, তবু ব্রুকলীন ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনা চালিয়েছি কিন্তু পরীক্ষা দেবার পরই বিপদে পড়লাম।

কেন স্যার ?

মিঃ রায় ওর কথা না শুনেই আপন মনে বলে যান, একটা সামান্য কাজ পেলাম কিন্তু যা পেতাম, তা দিয়ে দু'বেলা খাওয়া আর থাকা সম্ভব নয়।

বসন্ত হতবাক।

এক শীতের রাতে সামান্য একটা পাতলা সুট পরে ফুটপাতের ধারে বসে আছি। হঠাৎ আমার এক অধ্যাপক আমাকে ঐভাবে বসে থাকতে দেখেই থমকে দাঁড়ালেন।

এবার উনি বসন্তর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, ঐ অধ্যাপকের কৃপাতেই আমি জীবনে দাঁড়িয়ে গেলাম।

এতক্ষণে বসন্তর মুখে কথা আসে, আমরা স্যার ভাবতেই পারি না।

ঐ অধ্যাপক ছাড়া আর একজন শিক্ষক আমার উপকার করেছিলেন।

তাই নাকি স্যার ?

হ্যাঁ, উনি আমাকে সাহায্য না করলে বোধ হয় ম্যাট্রিক পরীক্ষাই দেওয়া হতো না। মিঃ রায় একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রশ্ন করেন, ঐ শিক্ষক কে ছিলেন জানো ?

কে স্যার ?

তোমার বাবা।

এবার বসন্ত সত্যি খুশীর হাসি হাসেন

তিন

কাট! দু'হাত তুলে পরিচালক চিৎকার করেই ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, না, না হলো না।

নায়ক—নায়িকা এর ওর দিকে তাকান।

পরিচালক নায়কের সামনে এসে বলেন, কমলা নাইটি পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ক্রীম মাখছে। আপনি ঘরে পা দিয়েই অবাক হয়ে থমকে দাঁড়াবেন। ভুলে যাবেন না, আপনি ওর রূপ দেখে, যৌবন দেখে মুগ্ধ। তারপর একটু হাসবেন। হাসির পরই খুব জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলবেন।

এবার পরিচালক নায়িকার সামনে এসে বলেন, বসন্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলার পরই আপনি আয়নায় ওর প্রতিচ্ছবি দেখে একটু হাসবেন। তারপর ডায়লগ শুরু। তারপর অ্যাকসান।

দুজনের দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে পরিচালক জিজ্ঞেস করলেন, বুঝেছেন ?

দুজনেই মাথা নাড়লেন।

পরিচালক এবার নায়ককে বললেন, ডোণ্ট ফরগেট ইউ হ্যাভ অ্যাটেনডেট এ ককটেল। একটু বেশীই ড্রিঙ্ক করেছেন। সুতরাং দরজার সামনে এমনভাবে থমকে দাঁড়াবেন যেন বোঝা যায়, আপনি ঠিক স্বাভাবিক না।

বুঝেছি।

তবে বী কেয়ারফুল, আপনি কিন্তু মাতাল হন নি।

এবার নায়ক হেসে বললেন, আই উইল ট্রাই।

পরিচালক ঐখানে দাঁড়িয়ে এক পাক ঘুরে সব দেখে নিয়ে বললেন, ক্যামেরা, রেডি ?

ইয়েস !

উপরের দিকে তাকিয়ে একজন লাইটম্যানকে বললেন, জয়দীপ, ফিলটারটা ঠিক রেখো।

হ্যাঁ, ঠিক আছে।

কমলা, টেক ইওর পজিশন ! বসন্ত মুভ আউট। শিকারী বিড়ালের মত পরিচালক মুহূর্তের মধ্যে সব কিছু দেখেই চিৎকার করেন, সাইলেন্স !

ক্যামেরা !

সাউণ্ড !

সীন ফাইভ, শট সেভেন, টেক থ্রী !

ক্ল্যাপস্টিক দিয়ে সহকারী পরিচালক ক্যামেরার সামনে থেকে সরে যেতেই কমলা হামিং করতে করতে মুখে ক্রীম মাখেন কিন্তু ক্যামেরা তখন মিড শটে ফ্রেমিং করেছে বারান্দা আর বেডরুমের দরজা। পরিচালক ইশারা করতেই বসন্ত দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়ান।

বাঃ! পরিচালক খুশী হয়ে মনে মনেই হাসেন। ক্যামেরা প্যান করে মিড লং শটে দুজনকে ধরেছে ;......ক্লোজ আপ—আয়নায় বসন্তকে দেখেই কমলা হাসেন।

কমলা—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী দেখছ ?

আবার ক্যামেরা মিড লং শটে দুজনকে ধরেছে।

বসন্ত—দেখছি আর ভাবছি।

কমলা—কী দেখছ আর কী ভাবছ ?

বসন্ত—দেখছি মার্লিন মনরো, লিজ টেলরকে ; দেখছি রাজলক্ষ্মীকে, রোহিণীকে, সাবিত্রীকে।

কমলা—(হেসে) আর কী ভাবছ ?

বসন্ত—বাবা এতকাল মাস্টারী করলেও শুধু সুশোভন রায়ই তাঁর ছাত্র।

—আর কিছু ভাবছ না ?

—আর ভাবছি, এতকাল কেউ তোমাকে কিডন্যাপ করে নি কেন ? রেপ করে নি কেন ?

—আঃ! ডোণ্ট বী সিলি!

কাট!

ক্যামেরা থামতেই গুঞ্জন।

পরিচালক বললেন, ওয়েল ডান!

নায়ক—নায়িকা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন।

একটু দূরে চেয়ারে বসেছিলেন প্রযোজক মিঃ মল্লিক। আধুনিক, সুদর্শন, মধ্যবয়সী। বুশ শার্টের দুটো বোতাম খোলা। গলায় সোনার চেনের সঙ্গে ডায়মণ্ড ঝুলছে। পাশে টিপয়ের উপর একটা অল লেদার ব্রীফ কেস। তার উপর এক প্যাকেট বেনসন হেজেস সিগারেট ও লাইটার। আবছা অন্ধকারে বসে আলোয় আলোকিত নৈশ পোশাকে নায়িকাকে দেখে তার মুখে তৃপ্তির হাসি।

মিঃ মল্লিকের পিছনেই একজন শাগরেদ দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বললেন, দোলাদির মত গ্রেসফুল অ্যাকট্রেস আর হবে না।

মল্লিকের শাগরেদ হিসাবে দু'চারদিন সর্বজনপ্রিয়া অভিনেত্রীর বাড়িতে যাতায়াত করেই আজকাল এমনভাবে কথাবার্তা বলে যেন সে তাঁর বহু কালের পরিচিত। এবং অত্যন্ত ঘনিষ্ঠও।

আর মিঃ মল্লিক ? তিনি প্রযোজক। পরিবেশকও। পুরো ন'লাখ নিজের গ্যাঁট থেকে দিয়ে এই ছবি করেছেন। নায়িকার অর্থের লালসা পুরোপুরি খুশি করেই তিনি হঠাৎ নায়িকার অত্যন্ত আপন হয়ে উঠেছেন।

সেট'এ চা এসেছে। নিদারুণ কর্মব্যস্ততার মাঝখানে থনিকের

বিরতি। ঈষৎ চাঞ্চল্য। একটু হাসাহাসি। পরিচালক ক্যামেরা-ম্যানের সঙ্গে নিবিড় আলোচনায় মগ্ন।

নায়িকা এদিক-ওদিক দেখে একটু চড়া গলায় বললেন,. বয়ফ্রেণ্ড কী পালিয়ে গেল ?

কর্মীদের মধ্যে দু'তিন জন প্রায় একসঙ্গে বললেন, ঐ তো প্রডিউসার সাহেব বসে আছেন।

নায়িকা দু'পা এগিয়ে মিঃ মল্লিকের সামনে এসে একটু হেসে বললেন, তুমি এই অন্ধকারে বসে আছো ?

হাসেন মিঃ মল্লিকও। বলেন, তুমি এমন পোশাক পরেছ যে ইচ্ছে করলেও তো কাছে যেতে পারছি না।

পরিচয় মাত্র মাস কয়েকের কিন্তু সিলভার টনিকের এমনই গুণ যে সর্বজনবন্দিতা বাংলা চলচ্চিত্র জগতের উর্বশী আস্তে ওর গালে একটা চড় মেরে নিঃসংকোচে বললেন, এই পোশাকটা না থাকলে বোধহয় তুমি আসতে দ্বিধা করতে না ?

ইস।

ন্যাকামি করো না।

মিঃ মল্লিক হাসেন। হাসেন ফ্লোরের আরো অনেকে।

এবার দোলা বলেন, শোন, আজ টেলরকে আসতে বারণ করে দিও।

কেন ?

আজ আমার ট্রায়াল দেবার সময় হবে না। বাড়িতে ফিরে আবার তো পার্কের পার্টিতে যেতে হবে।

কিন্তু ঐ জীনস্ তো পরশুর আউটডোরে লাগবে।

তাহলে ?

মিঃ মল্লিক একটু ভেবে বলেন, এক কাজ করলে হয়……

কী ?

পার্কের পার্টিতে তো আমিও যাব। পার্টিতে ঘণ্টাখানেক থাকার

পর আমি বরং তোমাকে নিয়ে আজিজের ওখানে ট্রায়াল দিতে নিয়ে যাব।

দু'চার পেগ পেটে পড়ার পর আমাকে সামলাতে পারবে তো? দোলা হাসতে হাসতে প্রশ্ন করেন।

না।

হঠাৎ পরিচালকের চিৎকার, গেট রেডি ফর নেক্সট শট্।

এক মুহূর্তে সব হাসাহাসি বন্ধ হলো। শুরু হলো সহকারী পরিচালকদের একটু ছোটাছুটি। ক্যামেরাম্যানের তৎপরতা। মেকআপম্যান এগিয়ে এলেন নায়কের কাছে।

দোলা একটু ঝুঁকে মিঃ মল্লিকের কানের কাছে মুখ নিয়ে একটু চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, লাস্ট শট্টা কেমন লাগল?

সুপার্ব।

চার

ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বসন্ত চুল ব্যাক ব্রাস করছে, কমলা ওর কোটের পকেটে পার্স, পেন, রুমাল রাখছে।

হঠাৎ মালা ঘুম জড়ানো চোখে ঘরে ঢুকেই বলল, বাপি, আমার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব আজ তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

আজ?

হ্যাঁ।

সাত তারিখে বোর্ড মিটিং। আট তারিখে এম. ডির পার্টি, ন তারিখের আগে তো আমার সময় হবে না।

না, না, ওরা আজই দেখা করবে।

মেয়ের কথায় কমলা অত্যন্ত বিরক্ত হলেও মুখে কিছু বলেন না।

বসন্ত ড্রেসিং টেবিলের সামনে থেকে দু'এক পা এগিয়ে আসতেই কমলা ওকে কোট পরিয়ে দেন।

বসন্ত জিজ্ঞেস করেন, ওদের কী এমন দরকার?

আমাদের ডিপার্টমেন্টের রি-ইউনিয়ন হবে। তাই সুভ্যেনির'-এ কয়েকটা অ্যাডভারটাইজমেন্ট চাই।

বসন্ত এবার হেসে বলেন, সে তো কমলা একবার মেহেতাকে ফোন করলেই······

কমলা আর চুপ করে থাকতে পারেন না। বলেন, এই ক'দিন আগে আমার জন্মদিনে উনি আমাকে এত দামী প্রেজেনটেশন দিয়েছেন। এখনই আমি ওকে কোন কথা বলতে পারব না।

বসন্ত ঘড়ি পরতে পরতে বলেন, তাছাড়া উনি বোধহয় তোমাদের লেডিজ ক্লাবের থিয়েটারের জন্য কলামন্দির ভাড়া করে দিচ্ছেন।

হ্যাঁ।

মালা বলল, বাট আফটার অল হি ইজ ইওর ডিস্ট্রিবিউটার!

সো হোয়াট? কমলা দপ করে জ্বলে ওঠেন, তোমাদের ডিপর্টমেন্টের রি-ইউনিয়নের জন্য বার্মিংহাম ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ডিস্ট্রিবিউটার অ্যাডভারটাইজমেন্ট দেবেন কেন?

মার কথায় মালা বিরক্ত হয়। বলে, উনি তোমাদের জন্য এত ব্যয় করেন আর আমাদের দু' চারটে বিজ্ঞাপন দিতে পারবেন না।

কমলা রেগে বলেন, না।

নীচে গাড়ির হর্ন বাজতেই বসন্ত বলেন, ঐ চৌধুরী এসে গেছে। তোমার বন্ধুদের অফিসে যেতে বারণ করো। আমি দেখছি কি করতে পারি।

মালা আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

মেয়ে বেরিয়ে যেতেই কমলা বলেন, মেয়েকে তো কিছুই বললে না?

কী বলব?

সকালে যা বললাম।

কাল বলব।

আর তুমি বলেছ।

আবার চৌধুরী হর্ন বাজায়।

বসন্ত বিদায় নেবার প্রাককালে কমলাকে কাছে টেনে নিয়ে চুমু খান।

বসন্ত ঘরের বাইরে পা দিতেই কমলা ওকে বলেন, গ্যারেজে একবার ফোন করো।

ওরা পরশু গাড়ি দেবে।

বসন্ত হনহন করে বেরিয়ে এসে চৌধুরীর পাশে বসেন। বারান্দার শেষ প্রান্তে এসে কমলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসেন।

চৌধুরী ওর দিকে তাকিয়ে হেসে বলেন, তুমি কাল থেকে আর বারান্দায় এসে দাঁড়াবে না।

কমলা হেসে জিজ্ঞেস করেন, কেন ?

তোমাকে দেখলে সারাদিন কাজে মন বসাতে পারি না।

অফিস যাচ্ছ কেন ? থেকে যাও। সারাদিন গল্প করব।

চৌধুরী গাড়ির বাইরে মুখ বের করে বলেন, সাত তারিখে বোর্ড মিটিং। পানের থেকে চুন খসলে তোমার বাবা কোম্পানী থেকে তাড়িয়ে দেবেন। বোর্ডের মিটিং এর পর থেকে সরকার অফিস যাবে আর আমি তোমার কাছে থাকব।

কমলা হেসে বলেন, ইউ আর ওয়েলকাম !

গাড়ি মোড় ঘুরে গোলপার্কে পৌঁছতেই চৌধুরী বলেন, বোর্ডের মিটিং-এর জন্য এমন টেনশনে আছি, যে রাত্রে সীতাকে আদর করা পর্যন্ত ভুলে গেছি।

বসন্ত হেসে বলেন, আসল কথা এত মাল টানছিস যে সীতাকে আদর করার ক্ষমতা থাকছে না।

তা বলতে পারিস।

কাল ব্রিজ মোহনের পার্টি থেকে কখন ফিরলি ?

বোধহয় একটা নাগাদ।

এম. ডি. গিয়েছিলেন ?

না।

বসন্ত আপন মনে একটু মুচকি হেসে বলেন, আমি জানতাম এম. ডি যাবেন না।

তুই কি সেজন্যই এলি না ?

গাড়ি আমীর আলি এভিনুতে চলছে।

বসন্ত বললেন, হ্যাঁ, সেটাও একটা কারণ।

গাড়ি চালাতে চালাতে চৌধুরী ওর দিকে মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করেন, অন্য আবার কী কারণ ?

ব্রিজ মোহনের বউটা এমন ন্যাকামি করে যে আমার গা জ্বলে যায়।

শালা, এখন রেখা ছাড়া আর কাউকে তোমার ভাল লাগে না।

রেখা ইজ রেখা !

কেন ছুঁড়ীটার মাথা খাচ্ছিস ?

কেন ছুঁড়ীটা স্বামীর প্রমোশনের জন্য আমার কাছে সব সময় ক্যানভাস করে ?

রেখা বোধহয় একটু বেশী গ্রাডি আছে, তাই না ?

একটু না, যথেষ্ট।

অনেকটা আমাদের সেই মিসেস ভোরার মত, তাই না ?

ঠিক বলেছিস।

আমাদের এম. ডি. এককালে মিসেস ভোরাকে নিয়ে কি স্ফূর্তিই করেছেন।

তা না হলে ভোরার মত পাঁঠা কখনও ডিরেক্টর হতে পারে ?

আমাদের গেস্ট হাউসের কেয়ার টেকার চ্যাটার্জীর কথা তোর মনে আছে ?

কেন থাকবে না ?

ঐ চ্যাটার্জী আমার ক্লাস ফ্রেণ্ড ছিল।......

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। ওর কাছে শুনেছি, সপ্তাহে অ্যাট লিস্ট দু'দিন এম. ডি মিসেস ভোরাকে নিয়ে সারাদিন গেস্ট হাউসে কাটাতেন।

গাড়ি গুরুসদয় রোড ছাড়তেই বসন্ত জিজ্ঞেস করলেন, বাই দ্য ওয়ে, বোর্ড পেপার্স আর রেডি ?

এম. ডি. রোজই এমন একটা ফ্যাকড়া তুলছেন যে আমার জান বেরিয়ে যাচ্ছে।

এদিকে আমার ডিরেক্টর আমাকে বলেছেন, যে দেড় কোটি টাকার মাল ডিফেন্স থেকে রিজেক্ট করেছে, তা বোর্ড মিটিং'এর আগেই বিক্রি করার ব্যবস্থা করতে হবে।

শালা ডিরেক্টরগুলো যে কি ভাবে।

চৌধুরী, ডিরেক্টর না হওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই।

পাঁচ

হ্যালো !

কে ?

কমলা, আমি মিসেস মোহন।

বলো, কী খবর ? কমলা সঙ্গে সঙ্গে আরো জানতে চান, কাল তোমার পার্টি কেমন হলো ?

আগে বলো, আমার বয় ফ্রেণ্ডকে নিয়ে তুমি কেন এলে না ?

আই অ্যাম সো সরি সুজাতা; কিছুতেই ম্যানেজ করতে পারলাম না।

কেন ? কাল কী অন্য কোন পার্টিতে......

কমলা হেসে বলেন, কাল কোন পার্টি ছিল না কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন আটকে পড়লাম যে......

কাল কোথায় গিয়েছিলে ?

বোম্বে থেকে মিঃ জোগলেকর আর তার স্ত্রী এসেছেন।

কোন জোগলেকর ? আগে যিনি নিউ ইণ্ডিয়াতে ছিলেন ?

না, না, ইনি পেনিনসুলার ইন্সিওরেন্সের জেনারেল ম্যানেজার। এর স্ত্রী আর বসন্ত একই প্লেনে একবার লণ্ডন গিয়েছিলেন বলে···

মিসেস মোহন হেসে প্রশ্ন করেন, আমার বয় ফ্রেণ্ডকে নিশ্চয়ই মিসেস জোগলেকর খুব পছন্দ করেন।

কমলাও হেসে বলেন, ওরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বসন্তকে খুব ভালবাসেন। বসন্ত তো বোম্বে গেলে কখনও কখনও ওরা জোর করে ওকে এয়ার পোর্ট থেকে নিয়ে যান।

এমন কোন মেয়ে দেখেছ যে আমার বয়ফ্রেণ্ডকে ভালবাসে না ?

কমলা হেসে বলেন, শুধু আমিই ওকে ভালবাসি না।

থাক, থাক আর ন্যাকামি করতে হবে না। কাল কী হলো, তাই বলো।

কী আর হবে ? পাঁচ মিনিট গল্পের পরই স্কচের বোতল বেরুল। বোতল শেষ না হলে কী ওদের কথাবার্তা শেষ হয় ?

মিসেস মোহন আবার একটু হেসে জিজ্ঞেস করেন, নাচ—গানও হলো নিশ্চয়ই ?

আমি নাচি নি ; তবে বসন্ত আর বীণা নেচেছে।

মিসেস জোগলেকরের নাম বুঝি বীণা ?

হ্যাঁ।

বীণা নিশ্চয়ই ড্রিঙ্ক করেছিল ?

না, না, ও ড্রিঙ্ক করে না।

তুমি ?

যাস্ট এক পেগ নিয়েছিলাম।

জানো কমলা, কাল মিঃ গৌতম কী করেছেন ?

কী ?

দুটো তিনটে ড্রিঙ্ক পাঞ্চ করে এমন একটা অদ্ভুত প্রিপারেশন করেছিল যে ফার্স্ট রাউণ্ডেই আমি আর রেখা আউট হয়ে গেলাম।

রেখা আজকাল রেগুলার ড্রিঙ্ক করছে, তাই না?

হ্যাঁ। মিসেস মোহন বলেন, কী করবে বেচারা? পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টরের মেয়ে; স্বামী মোস্ট অর্ডিনারী কেরানীর ছেলে হয়েও অফিসার। দুজনের কেউই তাল সামলাতে পারছে না।

সুশোভন রায়ের মেয়ে কমলা এ ধরনের কথা বলেও না, শুনতেও ভালবাসে না। তর্ক করতে, প্রতিবাদ করতেও রুচিতে বাধল। শুধু বলল, রেখা এভাবে ড্রিঙ্ক করলে ওর ফিগারটা নষ্ট হয়ে যাবে।

মিসেস মোহন হেসে বলেন, তুমি জানো না ও যোগ-ব্যায়াম করছে?

না; আমি জানি ও উইকে দু'দিন গলফ্ খেলে বলেই……

কমলাকে কথাটা শেষ করতে দেন না মিসেস মোহন। তার আগেই হেসে বলেন, মিত্তির এমনভাবে রেখাকে তৈরী করছে যেন দু' এক বছরের মধ্যেই ও ডিরেক্টর হবে।

তবে মিত্তির ইজ এ ব্রিলিয়াণ্ট বয়; এ গুড বয় টু। তাছাড়া বয়স অল্প। ডিরেক্টর হয়ত একদিন হবে।

লেট হিম বী!

কমলাকে বেরুতে হবে। তাই আর বিশেষ কথা বলতে চান না। কথা শেষ করার আগে জিজ্ঞেস করেন কাল কখন পার্টি শেষ হলো?

কিছু জানি না ভাই। সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে দেখি আমি ড্রইংরুমের কার্পেটে শুয়ে আছি।…

আর মিঃ মোহন?

শুনলাম উনিও ড্রইংরুমের সোফায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

কমলা হেসে বলেন, তাহলে তো পার্টি দারুণ সাকসেসফুল, তা বলতে পারো।
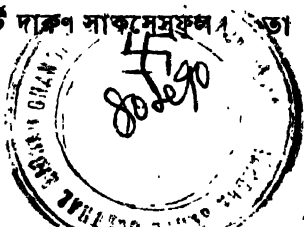
ছয়

ডিরেক্টরের সঙ্গে এতক্ষণ কথাবার্তা বলে বসন্ত নিজের ঘরে এসেই টেলিফোন তুলে পি. এ'কে বললেন, জলি, অশেষকে এক্ষুণি আসতে বলো। তারপর ফ্যাক্টরীতে মেলাও।

মিত্তির ঘরে ঢুকে বসন্তকে অত্যন্ত চিন্তিত, উত্তেজিত দেখে থমকে দাঁড়ায়।

বসো।

মিত্তির বসতে না বসতেই জলি ফ্যাক্টরীর লাইন মিলিয়ে দিয়ে বলে, স্যার, মিঃ গুহ হোল্ডিং।

বসন্ত কোন ভূমিকা না করেই বলেন, গুহ, তোমাদের জন্য তো আমরা মরতে বসেছি। বোর্ড মিটিংএর আগে ঐ মালটা ডিসপোজ করতেই হবে।

মিঃ গুহ কি বলেন, তা মিত্তির শুনতে পায় না, বুঝতে পারে না। শুধু বসন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

যাই হোক ঐ রিপেয়ারগুলো এই উইকের মধ্যেই শেষ করে দাও। আর হ্যাঁ, ভাই তুমি নিজে চেক আপ করে নিও যে স্পেয়ার্স ঠিক আছে কিনা। আই অ্যাম ট্রাইং টু ডাম্প দোজ সাম হোয়ার।

মিত্তির কিছু বোঝে, কিছু বোঝে না।

হঠাৎ বসন্ত খুব জোরে হেসে উঠে বলে, শালা, গঙ্গার পাড়ে অত বড় বাংলোয় সুন্দরী বউকে নিয়ে রাত কাটাও বলেই তোমার মত মিস্ত্রিও তো রোমান্টিক হয়।

মিত্তিরও একটু হাসে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বোর্ড মিটিং'এর পরের উইক-এণ্ডেই আসব।......কী? হ্যাঁ, হ্যাঁ, কমলাকে নিয়ে আসব। আচ্ছা বাই।

টেলিফোন নামিয়ে রেখেই বসন্ত মিত্তিরের দিকে তাকিয়ে বললেন, দ্যাখো অশেষ, আই ওয়াণ্ট টু গিভ ইউ এ চ্যালেঞ্জিং অ্যাসইনমেণ্ট।

মিত্তির হেসে বলেন, আই উইল সার্টেনলি ট্রাই মাই বেস্ট।

শোনো, তুমি কালই বোম্বে যাও অ্যাণ্ড ট্রাই টু কনভিন্স মিঃ জোসেফ টু ফাইনালাইজ দ্য ডিল উইদিন দিস উইক।

কিন্তু পোর্ট কমিশনার্সের চেয়ারম্যান যে ...

বসন্ত হেসে বলেন, আমাদের এম্ ডি'র শালা শিপিং অ্যাণ্ড ট্রান্সপোর্ট মিনিস্ট্রির জয়েন্ট সেক্রেটারী। চেয়ারম্যানকে আজ সকালেই তিনি টেলিফোনে সবকিছু বলেছেন। ইউ আর টু ট্যাকস্ জোসেফ ওনলি।

শুনেছি, ও দারুণ ঘুষ খায়।

খাবেই তো! বসন্ত বেশী গম্ভীর হয়ে বললেন, যে লোকটা প্রতি বছর 'প্রায় একশ' কোটি টাকার মেশিনারীজ কিনছে, সে কী মাসে মাসে আড়াই হাজার টাকা মাইনে নিয়ে খুশী থাকতে পারে?

এবার মিত্তিরও একটু হেসে বলেন, তা ঠিক।

আমি খবর পেয়েছি, জোসেফ ক'দিনের ছুটি নিয়ে বাড়িতেই বসে আছে। ইউ গো, মীট হিম, এণ্টারটেন হিম। আমি ডিস্ট্রিবিউটারদের বলে দিয়েছি; দে উইল গিভ ইউ এভরিথিং ইউ মে রিকোয়ার।

মিত্তির একটু ভেবে বলে, কাল না গিয়ে পরশু যাই?

কেন? কাল যেতে কী আপত্তি?

আপত্তি কিছু নেই; তবে কাল রেখাকে ওর বাবা-মার কাছে পৌঁছে দিতাম।

বসন্ত একটু হেসে বলেন, রেখাকেও সঙ্গে নিয়ে যাও। ও তোমার সঙ্গে গেলে তোমারও সাহায্য হবে।

মিত্তির খুশীর হাসি হেসে বলে, তাহলে তো ভালই হয়। রেখারও বোম্বে দেখা হবে।

রেখা বোম্বে যায় নি?

না।

আগে বলো নি কেন? উত্তরের অপেক্ষা না করেই বসন্ত বলেন, ঠিক আছে। রেখাকে বলে দিও, এবার থেকে বছরে তিন-চারবার ও বোম্বে যাবে।

তাহলে রেখাকে ফোন করে জানিয়ে দিই যে আমরা কাল......

হ্যাঁ, জানিয়ে দাও কিন্তু অফিসের কেউ না জানে তোমরা কোথায় যাচ্ছ। এমন কি আমাদের বোম্বে অফিসকে পর্যন্ত কিছু জানানো হচ্ছে না।

ঠিক আছে।

আমি মার্কারীকে বলে দিচ্ছি। টিকিট তোমার বাড়িতেই পৌঁছে দেবে আর তাজ'এ তোমাদের বুকিংও করে দেবে।

সান্তাক্রুজে কেউ থাকবেন কী?

হ্যাঁ, মিঃ মালকানি নিজেই থাকবেন। আর মার্কারী তোমার গাড়ির ব্যবস্থাও করবে।

থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি ম্যাচ।

দু'দিন পরে সকালবেলায় বারান্দায় বসে বসন্ত খবরের কাগজ পড়ছে, এমন সময় কমলা এসে বলল, তোমার ডিরেক্টর সাহেবের ফোন।

এই সাত সকালে? কমলা কিছু বলার আগেই বসন্ত তাড়াতাড়ি গিয়ে টেলিফোন ধরেন, গুড মর্নিং স্যার।

মর্নিং। এনি নিউজ ফ্রম বোম্বে?

মিঃ জোসেফ কাল অনেকক্ষণ মিত্তিরের সঙ্গে কাটিয়েছেন। কিছু কথাবার্তাও হয়েছে।......

মিঃ গ্রেবাল গম্ভীর হয়ে বলেন, বাট টাইম ইজ সর্ট। আমার মনে হয়, আপনি আজই বোম্বে যান অ্যাণ্ড ইউ ট্রাই অন ইওর ওন।

অল রাইট স্যার?

আগে থেকে মিত্তিরকেও কিছু জানাবেন না। ইজ হি স্টেইং অ্যাট তাজ ?

হ্যাঁ স্যার।

তাহলে আপনি সোয়াটনে উঠবেন অ্যাণ্ড আই থিংক ডি'পেনা উইল বী হেলপফুল টু ইউ।

আই অলসো থিংক সো স্যার।

বাট বী কেয়ারফুল, অফিসের কেউ যেন কিছু না জানে।

না স্যার, কেউ জানবে না।

এম্‌ ডি, আমি আর আপনি ছাড়া যেন……

না স্যার আপনি চিন্তা করবেন না।

হাউ ইজ কমলা ?

ভাল আছে স্যার। থ্যাক ইউ ভেরি মাচ।

বোম্বে থেকে ফিরে এসে একদিন কমলাকে নিয়ে এসো।

আসব স্যার।

আর মিঃ রায়ের গার্লফ্রেণ্ড কেমন আছে ?

মালাও ভাল আছে স্যার।

গিভ হার মাই লাভ।

থ্যাক ইউ স্যার।

সাত

নিউ বেঙ্গল স্টুডিও'র ছু'নম্বর ফ্লোর আজ যেন মায়াপুরী। আর্ট ডিরেক্টর শ্যামলবাবু আর তার লোকজন এক সপ্তাহ ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই মায়াপুরী তৈরী করেছেন। তবু স্যুটিং'এর আগে তিনি নিজে আরেকবার সবকিছু ভাল করে দেখছেন। হঠাৎ শ্যামলবাবু চিৎকার করে উঠলেন, এই নিত্য, এই পর্দাটা ঠিক করে দে।

নিভ্য পর্দা ঠিক করে দেবার পরই আবার শ্যামলবাবু চিৎকার করেন, চন্দন, টেলিফোনের তার দাঁত বের করে রয়েছে কেন?

চন্দন দৌড়ে এসে টেলিফোনের তার ঠিক করে দেয়।

ক্যামেরাম্যান আলো পরীক্ষা করছেন। এক নম্বর সহকারী পরিচালক শীলা দেবীকে স্ক্রীপ্ট পড়াচ্ছেন। পরিচালক আর প্রযোজক সিগারেট খেতে খেতে খুব চাপা গলায় কি যেন আলোচনা করছেন।

এমন সময় মেকআপ নিয়ে নায়ক সেটে এসে হাজির হয়েই থমকে দাঁড়ালেন। চারদিক তাকিয়ে একটু হাসলেন।

নায়ককে দেখে কেউ সন্ত্রস্ত, কেউ যেন কৃতার্থ।

নায়ক দু'এক পা এগিয়ে সেটের প্রায় মাঝখানে এসে বললেন, শ্যামলদা, কনগ্রাচুলেসনস্!

শ্যামলবাবু হেসে বললেন, থ্যাক ইউ বস্!

মিঃ মল্লিক আর পরিচালক কাছে আসতেই নায়ক বললেন, শ্যামলদা দারুণ কাজ করেছে!

মিঃ মল্লিক হেসে বললেন, সত্যি শ্যামলবাবু খুব ভাল কাজ করেছেন। একটু থেমে বললেন, একটা ছবি প্রডিউস করার ইচ্ছা বহুদিনের কিন্তু এখন দেখছি আরো ছবি না করে পারব না।

নায়ক মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, কেন? হঠাৎ এ রকম সিদ্ধান্ত কেন?

আপনাদের সবার প্রেমে পড়ে গেছি।

নায়ক মিঃ মল্লিকের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, সবার? নাকি শুধু একজনেরই?

একসঙ্গে তিনজনেই হেসে ওঠেন খুব জোরে।

আউট সাইডার্স প্লীজ গো আউট! পরিচালক প্রধান সহকারী পরিচালককে বললেন, মানিক, বাইরের কেউ যেন না থাকে।...... এই বিদ্যুৎ, ওখানে কারা? ওদের বাইরে যেতে বলো।......মানিক,

বাইরের লোকজন চলে গেলে গেট বন্ধ করে দিও। সুটিং উইল স্টার্ট উইদিন ফাইভ মিনিটস।

না, পাঁচ মিনিটে হলো না। সবকিছু ফাইন্যাল চেক আপ করতে মিনিট পনের-কুড়ি কেটে গেল। আর্টিস্টদের আরেকবার সবকিছু বোঝাতে আরো কয়েক মিনিট পার হলো।

ক্যামেরা রেডি?

ইয়েস।

সাউণ্ড? সুটিং শুরু করব?

অদৃশ্য কণ্ঠস্বরে শোনা গেল, ইয়েস, আই অ্যাম রেডি!

এবার পরিচালক নায়কের দিকে তাকিয়ে বললেন, বস্! প্লীজ টেক ইওর পজিশন।

সাইলেন্স!

লাইটস্ অন!

ক্যামেরা!

সাউণ্ড!

সীন ফিফটিন, শট ফাইভ, টেক টু! খটাস!

নায়ক খুব খুশী ও উত্তেজিত অবস্থায় কানে টেলিফোন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন, স্যার, ইট ইজ ডান!

মুহূর্তের জন্য নীরব।

না, না, স্যার, ধন্যবাদ দেবেন না। আপনার কথা মত কাজ করেছি বলেই···

নায়ক আবার নীরব।

হ্যাঁ স্যার মিঃ মালকানি আমার সামনেই পেমেণ্ট করেছেন।

ফাইলে অর্ডারও হয়ে গেছে। ডিটেলড্ এগ্রিমেণ্ট আজ বিকেলে অথবা কাল সকালে সই হবে।

আবার মুহূর্তের নীরবতা।

হ্যাঁ স্যার, মিত্তিরকেই পাঠাব আর আপনার কথা মত দিল্লী হয়েই ফিরব।

নায়ক আবার থামেন। কি যেন শোনেন। তারপর বলেন, হ্যাঁ স্যার, তাই হবে।

কাট!

মেকআপম্যান দৌড়ে গিয়ে নায়কের মুখে পাফ বুলিয়ে দেন। ব্রাশ দিয়ে চুলও ঠিক করা হয়। সঙ্গে সঙ্গেই পরবর্তী শট নেওয়া হয়।

নায়ক টেলিফোনে বলছেন, অশেষ এক্ষুনি আমার কাছে চলে এসো।

কাট!

আবার পাঁচ-সাত মিনিটের বিরতির পরই স্যুটিং শুরু হয়।

টুং টাং!

কাম ইন!

মিত্তির আর রেখা ঢুকতেই বসন্ত বলেন, এসো, অশেষ এসো! আরে! সুইট গার্ল তুমিও এসেছ।

রেখা হেসে বলেন, তবে কী আমি একলা একলা ঘরে বসে থাকব?

নায়ক হেসে ওর ঠোঁটের উপর একটা আঙুল দিয়ে বলেন, চুপ। তারপর খুব সিরিয়াস হয়ে মিত্তিরকে বলেন, শোন অশেষ, তুমি আমাদের ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে ফোন করো।

কী বলব?

বলবে তুমি আজই এসেছ ঐ এগ্রিমেন্ট সাইন করার জন্য।

মিত্তির মাথা নাড়ে।

আমি এখানে এসেছি বা এই ক'দিন ধরে আমরা কে কি করেছি, তা যেন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার না জানেন।

আচ্ছা।

আর তুমি ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে নিয়েই জোসেফের অফিসে যেও।

অল রাইট।

খুব দরকার হলে তুমি ডি. পেনা'র ঘর থেকে আমাকে ফোন করো।

হঠাৎ টেলিফোন বেজে ওঠে।

মিত্তির রিসিভার তুলেই বলে, ইয়েস! ইয়েস!

নায়ক অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকান।

মিত্তির হঠাৎ ঘাবড়ে গিয়ে বলে, যাস্ট এ মিনিট স্যার। তারপরই রিসিভার এগিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলে, এম. ডি!

নায়ক ওর হাত থেকে রিসিভার ছিনিয়ে নেয়। বলে, গুড মর্নিং স্যার! থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ স্যার!

প্রায় কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকে মিত্তির আর রেখা।

স্যার, আপনি শুধু আশীর্বাদ করবেন।...হ্যাঁ স্যার, মিত্তিরও আমাকে দারুণ হেলপ করেছে।

নায়ক একটু থামেন কিন্তু মুখে হাসি।

হ্যাঁ স্যার, বলব নিশ্চয়ই বলব। ইয়েস স্যার! ছেলেটি সত্যি ভাল। আচ্ছা গুড বাই স্যার।

কাট।

ঝড়ের বেগে স্যুটিং চলছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টরের অভিনন্দন লাভ করে ওরা ধন্য। হঠাৎ নায়ক রেখার গাল টিপে বলেন, যদি ভাল করে মাল খাওয়াও তাহলে এ বছরই তোমার স্বামীর প্রমোশন হবে।

রেখা হেসে বলে, যত ইচ্ছে মাল খান। কে আপনাকে বারণ করছে?

তুমি বসে বসে খাওয়াবে কী?

অশেষ না ফেরা পর্যন্ত তো আমি আছি।

কী অশেষ! রেখা কী আমাকে মাল খাওয়াবে?

মিত্তির হেসে বলে, নিশ্চয়ই খাওয়াবে।

কাট।

ক্ষণিক বিরতি।

একটু গুঞ্জন। চা আসে। শেষ হয়। আবার মেকআপম্যানরা শিল্পীদের সামান্য লাবণ্যচর্চা করেন। তারপর আবার স্যুটিং শুরু হয়।

রেখা হাতের গেলাসটা নামিয়ে রেখে বলেন, সত্যি শুনতে চান আমি কেন ড্রিঙ্ক করি?

হ্যাঁ।

রেখা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, আমি প্রমাণ করতে চাই আমি কারুর চেয়ে ছোট নই।

নায়ক শুধু একটু হাসেন।

রেখা আবার বলেন, আমার টাকাও চাই, মর্যাদাও চাই। যেভাবে হোক আমাকে আরো উপরে উঠতেই হবে।

ওর কথা বলার ভঙ্গী দেখে নায়ক যেন চমকে ওঠেন। বলেন, নিশ্চয়ই তোমাদের টাকা হবে, মর্যাদা হবে কিন্তু···

সে সব কিন্তু সরিয়ে দিতে আমি সবকিছু করতে রাজী।

ব্যাপারটা কী? আমাকে বলবে না?

রেখা হেসে বলল, তাহলে শুনুন।

কাট।

আট

বাপের মত হরিহরেরও উকীল হবার কথা। কেউ কেউ বলতেন, উকীল কেন, হরিহর জজ হবে। যে ছেলে লেখাপড়ায় এত ভাল, সে জজ না হয়ে পারে না।

সত্যি, হরিহর লেখাপড়ায় ভাল ছিলেন। অঙ্ক আর ইংরেজিতে বরাবর সব চাইতে বেশি নম্বর পেয়েছে। স্কুল কমিটির মেম্বারের ছেলে বলে নয়, লেখাপড়া আর স্বভাব চরিত্রের জন্যেই হরিহরকে সব মাস্টার মশাইরা স্নেহ করতেন।

কিন্তু মানুষ যা ভাবে, তা কী হয়?

হরিহর শেষ পর্যন্ত দারোগা হলেন। তাও ইন্সপেক্টর বা সাব-ইন্সপেক্টর না—এ. এস. আই। অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর।

সামান্য এ-এস-আই হলেও হরিহরের সম্মান ছিল, প্রতিপত্তি ছিল। যখন যেখানেই বদলী হয়েছেন, সেখানেই থানার বড়বাবু থেকে শুরু করে গ্রামের সাধারণ মানুষ পর্যন্ত ওকে ভালবাসতেন।

হরিহরের বদলীর চাকরি। তাছাড়া সব থানায় ভাল কোয়ার্টার নেই। বহু সময় হরিহরকে কনস্টেবলদের সঙ্গে ব্যারাকে থাকতে হয়। তাই পরিবার থাকে দেশের বাড়িতে।

আজকাল যেখানে সেখানে থানা গজিয়েছে। বহু জায়গাতেই না আছে স্কুল, না আছে হাসপাতাল। সব জায়গায় বাসা ভাড়াও পাওয়া মুশকিল। তাই নিজের কষ্ট হলেও ফ্যামিলিকে দেশের বাড়িতে রেখেছেন।

হরিহরের দেশের বাড়ি গণ্ডগ্রামে না, মহকুমা শহরে। তবে শহরের মাঝখানে নয়, এক প্রান্তে। হরিহরের বাবা মানদাবাবু তিন বিঘে জমি কিনলেও ছোট্ট একটা বাড়ি তৈরী করেছিলেন। পরিকল্পনা ছিল আস্তে আস্তে আরো ঘর-দোর তৈরী করবেন; আর বাকি জমিতে শাকসব্জীর চাষ হবে। এসব পরিকল্পনা কার্যকরী করার আগেই মানদাবাবু গত হলেন। ছুটি অবিবাহিতা বোনের বিয়ে দেবার সময় হরিহরকে উদ্বৃত্ত জমি বিক্রি করতে হয়। যাই হোক শেষ পর্যন্ত ঐ আড়াইখানা ঘরের বাড়িটি এখনও আছে।

ছোট্ট মহকুমা শহর হলেও ওখানে লেখাপড়া শেখার কোন অসুবিধে নেই। হরিহরের মত ওর তিনটে মেয়েই লেখাপড়ায়

ভাল ; মেয়েদের তুলনায় ছেলেটি তত ভাল না। যাই হোক নিজেদের বাড়ি, তার উপর লেখাপড়ার সুবিধে আছে বলেই হরিহর পরিবারকে এখানে রেখেছে। হরিহর প্রতি মাসেই একবার আসে। ওর অনুপস্থিতিতে এদের দেখাশোনার দায়িত্ব গুণময় মোক্তারের।

হরিহরের বাড়ির পশ্চিমেই গুণময় মোক্তারের বাড়ি ; তবে মাঝখানে বিরাট আম বাগান। ঐ আম বাগানের মালিকও গুণময় মোক্তার।

এই দুই পরিবারের হৃদ্যতা বহুকালের। গুণময়ের বাবা এ অঞ্চলের সব চাইতে খ্যাতনামা উকীল ছিলেন এবং হরিহরের বাবা তার বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। গুণময়ের বাবা স্নেহময়বাবু সত্যি মানদাবাবুকে ছোট ভাইয়ের মত ভালবাসতেন এবং তারই কথা মত মানদাবাবু এই জমি কেনেন। গুণময়ও মানদাবাবুকে শ্রদ্ধা করতেন এবং নিজের জ্যেঠা-কাকার চাইতে তার কথা বেশি শুনতেন।

মানদাবাবু মারা যাবার সময় গুণময়ের হাত ধরে বলেছিলেন, গুণো, আমার বোধহয় যাবার সময় হয়ে এসেছে। দেখিস, আমি মরে গেলে যেন এরা ভেসে না যায়।

না, না, ছোটকাকা, আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। আমি যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন এদের সবকিছু দায়িত্ব আমার।

সত্যি, গুণময় এ পরিবারের জন্য অনেক কিছু করেছেন। কখনও অর্থ দিয়ে, কখনও সামর্থ্য দিয়ে। কখনও আবার সৎ পরামর্শ দিয়ে। ওর সাহায্য না পেলে হরিহর কোনমতেই দুটি বোনের বিয়ে দিতে পারতেন না। হরিহরের মা মরার সময় উনি যা করেছেন, তা অনেক সৎ পুত্রও করত না।

গুণময় কদাচিৎ কখনও কোন ব্যাপারে দ্বিধা করলে ওর স্ত্রী বলতেন, তোমার যদি আর পাঁচটা ভাইবোন থাকত, তাহলে তুমি তাদের জন্য করতে না ? ছোট ঠাকুরপো কী আপন ভাইয়ের চাইতে কম ?

গুণময় সঙ্গে সঙ্গে মত বদলে নিতেন।

গুণময়ের স্ত্রী হরিহরকে অত্যন্ত পছন্দ করতেন। সংসারের প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারেও তিনি ছোট ঠাকুরপোর সঙ্গে পরামর্শ করতেন। হরিহরও বড় বৌদির মতামত না নিয়ে কোন কাজ করতেন না।

দিনগুলো বেশ কাটছিল।

গুণময়ের ছেলে শিবু দৌড়ে গিয়ে মাকে বলল, জানো মা, ছোট মা শুধু তেল আর নুন দিয়ে ভাত খাচ্ছে।

গুণময়ের স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে বড় এক বাটি মাছের ঝোল নিয়ে আম বাগানের ভিতর দিয়ে প্রায় দৌড়তে দৌড়তে এ বাড়িতে এসেই হরিহরের স্ত্রীকে বকুনি দেন, হ্যাঁরে রাধা, আমি কী মরে গেছি যে তুই নুন-তেল দিয়ে ভাত খাচ্ছিস? ভুলে যাস কেন আমিই তোকে বিয়ে দিয়ে এনেছিলাম?

পরিস্থিতিটা হালকা করার জন্য হরিহরের স্ত্রী হেসে বলেন, তুমি রাগ করছ কেন দিদি? রোজ রোজ কী ডাল তরকারী ভাল লাগে? তাই……

গুণময়ের স্ত্রীর রাগ আরো বেড়ে যায়, আজেবাজে কথা বললে তুই আমার কাছে মার খাবি। নে, মাছের ঝোল দিয়ে খেয়ে নে।

মাছের ঝোল দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে হরিহরের স্ত্রী হেসে বলেন, শিবুটা আসুক। ওর এই গোয়েন্দাগিরি আমি ঠাণ্ডা করে দেব।

হরিহরের বড় মেয়ে এগিয়ে আসতেই গুণময়ের স্ত্রী ওকে বকুনি দেন, এই হতভাগী, তুই কেন আমাকে কিছু বলিস নি? নাকি বড়মার কাছে বলতে তোরও লজ্জা হয়?

মা যে বারণ করল।

গুণময়ের স্ত্রী বলেন, এবার ছোট ঠাকুরপো এলে আমি সোজাসুজি বলব, তুমি বাপু তোমার বউ ছেলে-মেয়েকে নিজের কাছে নিয়ে যাও। আমার উপর দায়িত্ব থাকবে অথচ কেউ আমার কথা শুনবে না, এ চলতে পারে না।

খাওয়া-দাওয়ার পর হরিহরের স্ত্রী বলেন, রাগ করছ কেন দিদি? তোমাকে জ্বালাতন করারও তো একটা সীমা আছে?

আমি যেদিন নুন-তেল দিয়ে ভাত খাব, তুইও খাস। আমি কিছু বলব না। একটু থেমে আবার বলেন, তুই যদি আমার কথা না শুনিস তাহলে তুই একা ঐভাবে খাওয়া-দাওয়া করিস। আমার ছেলে-মেয়েদের কষ্ট দিতে পারবি না।

শেষ পর্যন্ত হার মানেন হরিহরের স্ত্রী। বার বার প্রতিবার।

রেখা খুব জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, দিদির পর পর দু'বার টাইফায়েড হলো। বড়মা যে কিভাবে দিদিকে বাঁচিয়ে ছিলেন, তা আমরা জীবনে ভুলব না।

বসন্ত এতক্ষণ পরে প্রথম প্রশ্ন করেন, বড়মা বেঁচে আছেন?

রেখা এক চুমুক জিন আর লাইস খেয়ে একটু হেসে বলল, বড়মা বেঁচে থাকলে কী আমি এমন অধঃপাতে যাই?

তুমি কী অধঃপাতে গেছ?

ও আবার হাসে। বসন্তর দিকে তাকিয়ে বলে, অধঃপাতে না গেলে এভাবে ড্রিঙ্ক করতে পারি? নাকি নাচের সময় আপনি আমাকে ঐভাবে আদর-টাদর করার সুযোগ পেতেন?

বসন্ত একটু ম্লান হেসে বলেন, একে বোধ হয় অধঃপাতে যাওয়া বলে না।

তবে কী? রেখা সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করেন, কমলাদি এভাবে কারুর সঙ্গে ড্রিঙ্ক করবেন? নাচের সময় কেউ কমলাদিকে কিস্ করার সাহস পাবে?

বসন্ত মুখ নীচু করে কি যেন ভাবেন। কোন কথা বলতে পারেন না।

রেখা বলেন, এসব যাক। যা বলেছিলাম, তাই বলি।

দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও স্কুল ফাইন্যাল পাস করার পর পরই হরিহরের বড় মেয়ের বিয়ে মোটামুটি ভালভাবেই হয়ে গেল। বিয়ের বেনারসী

আর জামাইয়ের ঘড়ি আংটি দিলেন গুণময়। ওর স্ত্রী স্বামীকে না জানিয়েই নিজের বিছে হারটা হরিহরকে দিয়ে বলেছিলেন, ছোট ঠাকুরপো, এইটা ভেঙে ছ'গাছা চুড়ি আর হার গড়িয়ে নাও।

কিন্তু বড়দাকে না জানিয়ে…

এটা আমার ঠাকুমার হার। বিয়ে হবার পর ঠাকুমা আমাকে দিয়েছিলেন। উনি এ হারের কথা কিছুই জানেন না।

না, না, বড় বৌদি, এ হার আমি নিতে পারি না।

ছাখো ছোট ঠাকুরপো, তুমি না নিলে আমি নিজেই ভাঙিয়ে চুড়ি আর হার গড়িয়ে দেব।

শেষ পর্যন্ত হরিহর ঐ হার নিয়েছিলেন।

এসব সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও বিয়ের জন্য হরিহরের বেশ কিছু দেনা হলো। টানাটানির সংসারে অভাব অনটন নিত্যকার ঘটনা হয়ে দাঁড়াল।

তবু দিন চলছিল কিন্তু হঠাৎ বছরখানেকের মধ্যেই গুণময়ের স্ত্রী মারা গেলেন। হরিহরের পরিবারের সবাই চোখে অন্ধকার দেখলেন।

সময় থমকে দাঁড়াতে জানে না। তবু দিন যায়, দিন আসে। মাসের পর মাস চলে যায়। বছর ঘুরে নতুন বছর আসে। তারপর নতুন বছরও একদিন পুরানো হয়।

পৃথিবীর রং বদলায়। কত নতুন গজিয়ে ওঠে, কত পুরানো পরিচিত ছবি চিরকালের মত হারিয়ে যায়। পুরানো পৃথিবীর কিছু কিছু পরিচিত চেহারাও হঠাৎ নতুন রূপে হাজির হয়ে চমকে দেয়।

হরিহর সাব-ইন্সপেক্টর হয়েছেন। মাইনে বেড়েছে কিন্তু ধারদেনার জন্য হাতে পুরো দু'শ টাকাও পান না। দুটো মেয়ের পর দায়িত্ব কমলেও বাড়িতে স্ত্রী ছাড়াও ছোট মেয়ে আর ছেলেটা আছে। ওরা দুজনেই লেখাপড়া করছে। এর উপর স্ত্রী অসুস্থা।

ওদিকে শিবু বহুকাল বাড়ি ছেড়েছে। সেই ছেলের অন্নপ্রাশনের

সময় শেষ এসেছিল। আর আসে নি। সেও কত বছর হয়ে গেল। গুণময়ও কত বদলে গেছেন।

হ্যাঁরে রেখা, একবার জ্যেঠুর কাছে যাবি ?

রেখা মুখ না তুলেই জিজ্ঞেস করে, কেন ?

কেন আবার ? গোটা কয়েক টাকা চেয়ে আনবি।

রেখা চুপ করে থাকে।

ওর মা আবার বলেন, আমি তো চাইতে পারি না। খোকনকে পাঠালেও উনি ভাগিয়ে দেন। তোকে তো জ্যেঠু খুব ভালবাসেন, তাই……

রেখা পড়তে পড়তেই মুখ বিকৃত করে বলে, কচু ভালবাসেন।

ও কথা বলিস না। উনি তোকে সত্যি খুব ভালবাসেন।

রেখা জানে মার হাতে সামান্য কিছু থাকলেও জ্যেঠুর কাছে যাবার কথা বলতেন না। জিজ্ঞেস করে, আজকের দিনটা চলে যাবে না ?

নারে মা ; হাতে একটা টাকাও নেই।

বিকেলে তো বলতে পারতে ! এই অন্ধকারে বাগান দিয়ে যেতে ভয় করে না ?

ওর মা এবার রেগে যান। বলেন, না যাবি তো চুপ করে বসে থাক। তাই বলে আজেবাজে কথা বলিস না। আজন্ম এই বাগান দিয়ে যাতায়াত করছেন। আর এখন বুড়োধাড়ী হবার পর উনার ভয় করে।

রেখা আর কোন কথা না বলে বই বন্ধ করে উঠে দাঁড়ায়। ওর মা জানেন, রেখা জ্যেঠুর কাছে গেলেই উনি বেশ কিছুক্ষণ গল্পগুজব না করে ওকে ছাড়েন না। তবু বললেন, একটু তাড়াতাড়ি আসিস।

রেখা ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে বলল, টাকা পেলেই আসব।

গুণময়বাবুর চোখ দুটো এত খারাপ হয়েছে যে সন্ধের পর লেখাপড়ার কাজ করতে পারেন না। তাই কোর্ট থেকে ফিরেই

কাজে বসেন। মক্কেলরাও তখনই আসে। সন্ধে লাগতে না লাগতেই উনি চেম্বার ছেড়ে ভিতরের ঘরে বা বারান্দায় এসে বসেন। রোজ না, মাঝে মাঝে পাড়ার দু'একজন বৃদ্ধ এসে ওর সঙ্গে গল্পগুজব করেন। কখনও কখনও নিজেও পাড়ায় বেরিয়ে পড়েন। তা নয়ত বাড়িতেই চুপচাপ শুয়ে বসে থাকেন। তারপর দেওয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে আটটা বাজতেই হাঁক দেন, এই সারদা, খেতে দিবি না?

খাবার পরই ঘুম।

গুণময়বাবুর দিন আবার শুরু হয় ভোর পাঁচটায়।

রেখা পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকেই সারদার ঘরে উঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস করে, সারদাদি, জ্যেঠু কোথায়?

সারদা স্বামীর ধুতিটা সেলাই করতে করতে বলে, কত্তা ঘরেই আছেন।

রেখা ঘরে ঢোকার আগেই জানালা দিয়ে দেখতে পায় জ্যেঠু আধা শোওয়া অবস্থায় আপন মনে বিড়বিড় করছেন। ওকে দরজার সামনে দেখেই উনি উঠে বসে হেসে বলেন, আয়, আয়! তোর কথাই ভাবছিলাম।

রেখা জ্যেঠুর কথা বুঝেও না বোঝার ভান করে একটু হেসে বলে, কেন? আমার কথা ভাবার কী কারণ ঘটল?

গুণময় একটু এগিয়ে এসে ওর হাত ধরে টান দিয়ে বলেন, তুই রোজ সন্ধের পর আসিস না কেন?

রোজ আসব কেন? আমার কী পড়াশুনা নেই?

তুই এলে তবু একটু গল্প করা যায়।

রোজ রোজ কী গল্প করব?

যা হয়। গুণময় ওকে আরো একটু কাছে টেনে নিয়ে বলেন, তাছাড়া ছোটবেলায় তুই রোজ আমার কোলে চড়ে ঘুরে বেড়াতি।

রেখা শাড়ির আঁচলটা টেনে বুকের উপর দিয়ে একটু সতর্ক সন্ত্রস্ত হয়ে বসেও বলে, এখন তো কোলে চড়ে বেড়াবার বয়স নেই।

ওরে হতভাগী, কোলে না চড়লেও একটু কাছে বসে তো জ্যেঠুর সঙ্গে গল্প করতে পারিস।

রেখা হঠাৎ চমকে উঠে বলে, জ্যেঠু, হাতটা সরিয়ে নাও।

গুণময় যেন ওর কথা শুনতেই পান না। জিজ্ঞেস করেন, বৌমার শরীর কেমন আছে?

রেখা গম্ভীর হয়ে উত্তর দেয়, ভাল না।

নগেনের ওষুধ খাচ্ছে তো?

আগে খেয়েছে; এখন বন্ধ আছে।

কেন?

খাবার পয়সা নেই তো ওষুধ আনবে কেমন করে?

গুণময় আরো একটু এগিয়ে আরো একটু নিবিড় হয়ে বলেন, আমাকে বলিস নি কেন?

রেখা সঙ্গে সঙ্গে বলে, আগে না বললেও এখন তো বলছি। দাও তো শ' দুয়েক টাকা।

শ' দুয়েক!

হ্যাঁ, শ' দুয়েক।

একসঙ্গে অত টাকা দেব কেমন করে? তুই রোজ সন্ধের পর এসে কিছু কিছু নিয়ে যাস।

আচ্ছা একশ টাকা দাও।

আমার কাছে অত টাকা কী থাকে? তুই আজ দশ-পনের······

রেখা ঝড়ের বেগে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, থাক, থাক, তোমাকে কিছু দিতে হবে না।

গুণময় হুমড়ি খেয়ে এগিয়ে এসে খপ্ করে ওকে আবার ধরে বলেন, রাগ করছিস কেন? আজ পঁচিশ দিচ্ছি; আবার দরকার হলেই আমাকে বলিস।

রেখা গুণময়ের কাছে যেতে চায় না। রাগ হয়, ঘেন্না হয়। অপমানও বোধ হয়। কাউকে কিছু বলতে পারে না। নিজের মনের

মধ্যেই সবকিছু চেপে রাখে কিন্তু মাঝে মাঝে যেন আর চেপে রাখতে পারে না। হঠাৎ মার মুখের দিকে তাকিয়েই নিজেকে সংযত করে। রেখা আবার যায় গুণময়ের কাছে। যেতেই হয়, না গিয়ে কোন উপায় নেই। প্রায় নিয়মিতই যেতে হয়। আর গুণময় সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্যও করেন না, দ্বিধাও করেন না।

আর ঐ এক হারামজাদা হচ্ছে নগেন ডাক্তার। দেখে মনে হয় ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না। কথা শুনে তো সবাই গলে যায় কিন্তু ও যে কি শয়তান তা রেখা জানে।

নগেন ডাক্তার প্রথম দিন বাড়াবাড়ি করতেই রেখা আর চুপ করে থাকতে পারে নি। প্রতিবাদ করেছিল। নগেন ডাক্তার সোজাসুজি বলেছিল, একটু গায় হাত লাগলেই যদি ফোঁস করে উঠিস তাহলে আট আনা—এক টাকা নিয়ে আমার কাছে আসিস না।

স্ত্রীর শরীর আরো খারাপ হয়েছে শুনেই হরিহর ছুটে এলো। পুরো একমাস বাড়িতে থেকে স্ত্রীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করল। নগেন ডাক্তার তিন-চারদিন এসে দেখলেন। ওষুধও দিলেন। বেশ উন্নতিও হলো রাধার। তারপর একদিন হরিহর ফিরে যান কর্মস্থলে।

মাস দুয়েক ভাল থাকার পর রাধার আবার পেট ব্যথা শুরু হলো। প্রথম দু' একদিন একটু কম, তারপর অসহ্য। আগের চাইতে অনেক বেশী কষ্ট পান রাধা। রেখা আবার ছুটে যায় নগেন ডাক্তারের কাছে।

বসন্ত নির্বাক হয়ে শোনে। মাঝে মাঝে গেলাস তুলে মুখে দিতেও ভুলে যায়।

রেখা একটু হাসল। বিচিত্র হাসি। বসন্ত যেন ভয় পায়। তারপর বলে, ঐ দুজনের কাছে শিখেছিলাম কিছু নিতে হলে কিছু দিতে হয়। আর জেনেছিলাম, গরীবের মেয়ে পয়সা দিতে না পারলে দেহটাকে অপব্যবহার করতে দিলেই সব সমস্যার সমাধান হয়।

বসন্ত কি যেন বলতে গিয়েও বলতে পারল না।

রেখা হঠাৎ এক লাফে উঠে এসে বিচিত্র ভঙ্গীমায় ওর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, আমার স্বামী না, নগেন ডাক্তারই আমার এই দেহটা প্রথম উপভোগ করে।

ভয়ে বসন্তর মুখ শুকিয়ে যায়।

রেখা একটু পিছিয়ে এসে অনেকটা ক্যাবারে আর্টিস্টের মত পোজ করে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বলল, আমার ফিগারটা খুব ভাল, না? ইউ ক্যান অলসো এনজয় দিস বডি ইফ ইউ পে দ্য প্রাইস!

বসন্তর হাত থেকে গেলাসটা হঠাৎ পড়ে যায়। আতঙ্কে পিছিয়ে আসে। অস্ফুট স্বরে বলে, না, না, তোমাকে কিছু দিতে হবে না। অশেষের প্রমোশন এমনি হবে।

নয়

পার্থ সেন হেসে বললেন, এইত ক'দিন আগে মাইনে পেলে। এখনই ওভার-টাইমের পেমেণ্টের জন্য এত ব্যস্ত হবার কী হলো?

ছেলেরা এর-ওর মুখের দিকে তাকায়। শেষ পর্যন্ত দিলীপ বলল, আসল কথা হচ্ছে সামনের উইকে তিন দিনের ছুটি পড়ছে বলে আমরা একটু বেড়াতে যাব ভেবেছি।

পার্থ সেন সেলস অফিসের অফিস-ইন-চার্জ। বছর দুয়েকের মধ্যেই রিটায়ার করবেন। আগে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্টও ছিলেন। মাত্র বছর দুয়েক হলো সব ছেড়ে দিলেও ইউনিয়নের কর্ম-কর্তারা পরামর্শের জন্য পদে পদে ওঁর কাছে ছুটে আসেন। এ অফিসের সবার কাছেই পার্থ সেন জনপ্রিয়। ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ চৌধুরী মিঃ সরকার বা অন্যান্য ডিরেক্টর ও অফিসাররাও ওঁকে ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন। ওঁরা সবাই জানেন পার্থ সেন বার বার প্রমোশন প্রত্যাখ্যান করার জন্যই সে এখন অফিস ইন-চার্জ; নয়ত

সে অনায়াসে পারচেজ ম্যানেজার বা সেলস ম্যানেজার হতে পারতো।

পার্থবাবু এখন ইউনিয়নের ব্যাপারে বেশী মাথা না ঘামালেও অফিসের রিক্রিয়েশন ক্লাবের নাটকের ব্যাপারে তাঁর উৎসাহের সীমা নেই। শুধু এঁর উৎসাহ ও আগ্রহের জন্যই রিক্রিয়েশন ক্লাবের দুটো নাটক স্টার বা বিশ্বরূপায় হবেই এবং সব সময় ইনি মুখ্য ভূমিকায়। এইত গতবার আলমগীরের ভূমিকায় কি অপূর্ব অভিনয় করলেন।

অফিসের সব ছেলে মেয়েই নির্বিবাদে পার্থ সেনকে বিরক্ত করে এবং উনিও নির্বিচারে ওদের সাহায্য করার চেষ্টা করেন। অফিসের সবাই জানে, পার্থদা ইচ্ছা করলে সব করতে পারেন।

এ অফিসের সবাই ভাল মাইনে পান। এইত দু' বছর আগে রমেশবাবু রিটায়ার করার সময় ওঁর ছেলে বিশ্বপতি ঢুকল। এখন সে সব কেটেকুটেই আটশ' সত্তর হাতে পাচ্ছে। সামান্য স্কুল ফাইন্যাল পাস ছেলে আর কি পাবে? যারা একটু সিনিয়ার তারা সবাই দেড়-দু' হাজার পায়। এর উপর ওভার-টাইম, বোনাস, এল-টি-সী ত আছেই। এখানেই কী শেষ? এর উপর সাপ্লায়ার ডিস্টিবিউটরদের প্রণামী আছে।

তাইতো কাজ করতে করতেই মুখ টিপে হাসতে হাসতে পার্থ সেন মুখ না তুলেই জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় বেড়াতে যাচ্ছিস? ডায়মণ্ডহারবার না দীঘা?

আদিত্য বলল, দীঘায় যাব পার্থদা।

সে ত একশ'-দেড়শ'র ব্যাপার। তার জন্যও ওভার-টাইমের টাকা দরকার?

আবার ওরা নিজেদের মধ্যে ইসারা করেই দিলীপকে কনুই দিয়ে গুঁতো দেয়। দিলীপ বলল, মাইনের টাকা ত মাকে দিয়ে দিই।...

পুরো টাকা?

ঢোক গিলে দিলীপ বলে, দিই পুরো টাকা কিন্তু মা আমাকে আড়াই শ' দিয়ে দেন।

মাথা নীচু করে কাজ করতে করতেই পার্থ সেন হাসেন আপন মনে কিন্তু সে হাসি ওরা দেখতে পায়।

পার্থবাবু বলেন, তোরা বড্ড ভাল ছেলে।

ছেলেরাও এবার একটু না হেসে পারে না।

পার্থ সেন এবার জিজ্ঞেস করেন, তোরা কে কে যাচ্ছিস ?

নীতিশ বলে, এখনও ফাইন্যাল হয় নি। ওভার-টাইমের টাকাটা পেলেই······

সরকার সাহেব ত ক'দিন পর আজই এলেন। আজ ওর অনেক কাজ। দেখি, কাল বলতে পারি কিনা।

দিলীপ বলল, কাল সরকার সাহেব সই না করলে······

পার্থ সেন জানেন ওকে ওভার-টাইমের টাকার ব্যবস্থা করে দিতেই হবে। তাই বললেন, যা যা, কাজ কর। আমি দেখছি কী করতে পারি।

দশ

তখনও ভোর হতে কিছুক্ষণ দেরি কিন্তু ইতিমধ্যেই পরিচালক তার পুরো ইউনিট নিয়ে আউট্রাম ঘাটের ধারে পৌঁছে গেছেন। আর্টিস্টরা মেক-আপ নিয়েই এখানে আসবে। আগে থেকে সব ঠিক করা আছে। তাই ক্যামেরাম্যানের সহকারীরা নির্দিষ্ট স্থানে ক্যামেরা বসায়। বড় টেপরেকর্ডারটা গাড়ির মধ্যে লুকানো হয়। পনের-কুড়ি মিনিটের মধ্যে অন্যান্য সব আয়োজন সম্পূর্ণ হতে না হতেই তিনখানা অ্যাম্বাসেডর পর পর এসে পৌঁছয়। গাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসেন আর্টিস্টরা, প্রযোজক, প্রডাকশন ম্যানেজার ও একজন মেক-আপম্যান।

পূবের আকাশের প্রথম আলো আউট্রাম ঘাটে পৌঁছতে না পৌঁছতেই লং শটে দিলীপ, নীতিশ ও আদিত্যকে কাঁধে ব্যাগ নিয়ে হেঁটে আসা নেওয়া হয়। একটা মিড লং শটে ওদের হাসি-খুশি মুখে কথাবার্তা বলাও নেওয়া হয়!

এবার আসল টেক।

ক্যামেরা ঠিক পজিশনে বসান হয়েছে। তিনজন আর্টিস্ট নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। রিফ্লেকটরের আলো ফেলা হয়েছে ওদের মুখে। ক্যামেরাম্যান ও পরিচালক ক্যামেরার ভিতর দিয়ে লুক-থ্রু করে দেখে নেন আর্টিস্টদের। তারপর পরিচালক ওদের বুঝিয়ে দেন, আপনারা এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখবেন গাড়ি আসছে কিনা। বার দুয়েক ঘড়ি দেখবেন। তারপরই হঠাৎ গাড়ি এসে দাঁড়াবে সামনে। সঙ্গে সঙ্গে সকলের মুখে হাসি।

হ্যাঁ, ঠিক কথা মতই শট নেওয়া হয়। পরিচালক খুশি।

ক্যামেরা পজিশন চেঞ্জ করে।

নেক্সট্ শট।

ঝপ করে গাড়ির দরজা খুলে বিমলবাবু বেরিয়ে আসেন হাসতে হাসতে। গাড়ির মধ্যে দুটি মেয়ে বসে থাকে।

কাট!

ক্যামেরা আবার নতুন পজিশন নেয়। গাড়ির ভিতরে লুকিয়ে রাখা টেপরেকর্ডারের মাইক্রোফোনটা বাইরে বিমলবাবুর আড়ালে থাকে। চারদিক থেকে রিফ্লেকটরের আলো পড়ে ওদের মুখে। সবকিছু ঠিকঠাক করে নেবার পর মনিটর! ও কে!

এবার টকিং শুরু হয়।

দিলীপ—(পকেট থেকে কাগজখানা বের করে) এই নিন বিমলদা, আপনার অর্ডার।

বিমল—(হাসি মুখে) কালই বের করতে পারলে?

নীতিশ—ভুলে যান কেন দিলীপ আমাদের অফিসের হিরো!

বিমল—দিলীপ যে কি মাল তা আমি জানি না ?

দিলীপ—(বিমলবাবুর দিকে চেয়ে) পারচেজ'এর শুভাশীসকে চেনেন ত ?

বিমল—খুব চিনি।

দিলীপ—ওকে শ' পাঁচেক দিয়ে দেবেন !

বিমল—আজই দিয়ে দেব।

আদিত্য—জানেন ত বিমলদা, আমাদের কোন মাড়োয়ারী—পাঞ্জাবী কিনতে পারবে না। আপনি আমাদের দেখলে আপনাকেও আমরা দেখব।

বিমল—আই নো দ্যাট। (হাতের ঘড়ি দেখে) যাও, যাও, এবার তোমরা রওনা হও ; আর দেরি করো না।

দিলীপ, নীতিশ ও আদিত্য গাড়িতে ওঠে।

বিমল—(গাড়ির জানলার কাছে মুখ নিয়ে) ললিতা, আমার বন্ধুদের যত্ন করো।

ললিতা হেসে শুধু মাথা নাড়ে।

গাড়ি স্টার্ট করে।

বিমলবাবু দাঁড়িয়ে হাত নাড়েন। গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বের করে দিলীপ আর ললিতাও হাত নাড়ে।

কাট !

এগার

মিঃ ঝুনঝুনওয়ালা পান চিবুতে চিবুতে বললেন না, না, নন্দীবাবু, ও দামে কেউ মাল কিনবে না। পিকদানীতে পিক ফেলে বললেন, দেওয়ালী দশেরার পর বাজী কী বিক্রি হয় ?

নন্দীবাবু একটু হেসে বললেন, হয় তবে কম।

কিন্তু অতগুলো টাকা ত আটকে থাকে। কবে কি রিটার্ন আসবে, তার ত ঠিক নেই।

হ্যাঁ, ঐ অতগুলো টাকা আটকে থাকবে বলেই ত...

মিঃ ঝুনঝুনওয়ালা একটু বিরক্ত হয়েই বললেন, আমি সব জানে। সোজা কথা আমি সাড়ে তিন লাখের বেশী দিতে পারবে না।

নন্দীবাবু মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, তাতে ত আমার বিশেষ কিছুই থাকবে না।

কেন ? আমি ওয়ান পার্সেন্ট দেব ; ওদের কাছ থেকেও পার্সেন্ট নিন। তাহলেই আপনি সাত হাজার পেয়ে যাবেন। মিঃ ঝুনঝুন-ওয়ালা আবার পানের পিক ফেলে বলেন, এই সামান্য কাজে আর কত আপনি চান ?

হঠাৎ ঘণ্টা বাজে নন্দীবাবু উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই মিঃ মল্লিক হাসতে হাসতে এগিয়ে আসেন।

মিঃ ঝুনঝুনওয়ালা হেসে বলেন, এসো হিরো, এসো।

মিঃ মল্লিক চেয়ারে বসে বলেন, আমি হিরো ?

আরে বাবা ! প্রডিউসাররাই ত আসল হিরো।

আচ্ছা তুমি কাজ সেরে নাও।

ঝুনঝুনওয়ালা নন্দীবাবুর দিকে তাকিয়ে বলেন, বলুন কী করবেন ? যদি রাজী থাকেন তাহলে এখনই টাকা দিয়ে দিই।

নন্দীবাবু মুহূর্তের জন্য ভেবে নিয়ে বলেন, হ্যাঁ দিন।

ঝুনঝুনওয়ালা সঙ্গে সঙ্গে ড্রয়ার থেকে সাড়ে তিন লাখ টাকা বের করে নন্দীবাবুকে দেন। উনি টাকাটা ব্যাগে রেখে বলেন, আমি তাহলে কাল সকালে আসব।

না, কাল না ; পরশু আসবেন।

নন্দীবাবু চলে যেতেই মল্লিক জিজ্ঞেস করলেন, আবার কী দাঁও লাগালে ?

বাজী।

বাজী। কিসের বাজী?

ঝুনঝুনওয়ালা হেসে বলেন, আরে বোমা, হাওয়াই, পটকা…

মল্লিক অবাক হয়ে বলেন, সাড়ে তিন লাখ টাকার বাজী কিনছ?

ঝুনঝুনওয়ালা মুখ টিপে হাসতে হাসতে মাথা নেড়ে বলেন, হ্যাঁ।

বাজী পোড়াবার টাইম ত চলে গেল।

তাইতো সাড়ে সাত লাখের মাল সাড়ে তিনে পাচ্ছি।

সামনের বার দেওয়ালীতে এই সাড়ে তিন লাখের মাল কত টাকায় বেচবে?

ঝুনঝুনওয়ালা হেসে বললেন, এক সাল কেন অপেক্ষা করব? তার আগেই এই সাড়ে তিন লাখ বেচে দশ লাখ কামিয়ে নেব।

কিভাবে?

কেন? তুমি বিজনেস করবে?

নারে বাপু, আমি কোন জন্মে বাজীর ব্যবসা করব না।

ঝুনঝুনওয়ালার মুখে হাসি ধরে না। বলেন, তোমরা বাঙ্গালীরা ফুটবল খেলায় কী কম বাজী পোড়াও? লীগ-শীল্ডের খেলায় ত তোমরা বিশ-পঁচিশ লাখ টাকার বাজী পোড়াও।

মল্লিক চমকে উঠে বলেন. ঠিক বলেছ।

দুটো চেরিটি খেলায় আমার পুরো মাল বিক্রি হয়ে যাবে।

আর পুরোটাই দু'নম্বরের।

তা না হলে তোমার মত প্রডিউসারদের টাকা দেব কেমন করে?

মল্লিক হেসে বলেন, সত্যি তোমাদের বুদ্ধি আছে।

কী বলো হিরো? বুদ্ধি শুধু বাঙ্গালীদের আছে। আর সব শালা বুদ্ধু।

থাক। আর ন্যাকামি করতে হবে না।

ঝুনঝুনওয়ালা এবার মাথা নাড়িয়ে হেসে হেসে জিজ্ঞেস করেন, দোলার কী খবর?

মল্লিক ওর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার আলিপুরের ফ্ল্যাট খালি আছে?

উনি হেসে বললেন, তোমার আর দোলার জন্য সব ফ্ল্যাট খালি আছে।

তাহলে কাল বিকেলে আমরা আলিপুরে আসছি।

ক'দিন থাকবে?

দু'দিন।

তারপর?

এখান থেকেই আউটডোরে চলে যাব।

ঠিক আছে।

তুমি দোলাকে একবার ফোন করো।

তুমি দোলাকে বলো, ঐ সামান্য দু'আড়াই লাখের জন্য ওকে চিন্তা করতে হবে না।

হ্যাঁ, বলে দেব।

আর বলে দিও, মানালীর প্রোগ্রাম ফাইন্যাল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে কথাও ও জিজ্ঞেস করছিল।

ঝুনঝুনওয়ালা মুখে পান-জর্দা দিয়েই বলেন, দোলার কোন কথা আমি রাখি নি? আই ক্যান ডু এভরিথিং ফর হার।

বারো

কমলা দরজা খুলে দিতেই মালা চমকে ওঠে কিন্তু মুখে কিছু না বলেই সোজা নিজের ঘরে যায়। পিছন পিছন কমলাও ওর ঘরে ঢুকেই গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করেন, ক'টা বাজে?

মালা টেবিলের উপর খাতা-কলম-ব্যাগ রাখতে রাখতে মায়ের দিকে না তাকিয়েই বলে, বাড়ির সব ঘড়ি কী একসঙ্গে খারাপ হয়েছে?

তোমার ঘড়িতে ক'টা বাজে ? কমলার স্বর আরো কঠিন, আরো গম্ভীর।

সাড়ে দশটা।

কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলে ?

মনে নেই।

মালা, ঠিক ঠিক জবাব দাও।

তুমি এখন যাও ; আমি টায়ার্ড।

তার জন্য কী আমি দায়ী ?

বলছি, এখন যাও।

আমার প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব পেলেই আমি চলে যাব।

আমি এখন কোন কথার জবাব দিতে পারব না।

কমলা দু পা এগিয়ে মেয়ের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, রাত সাড়ে দশটায় বাড়ি ফিরে আমাকে মেজাজ দেখিও না!

মালা চেয়ারে বসে মুখ না তুলেই বলে, আমি মেজাজ দেখাচ্ছি না। তুমি এখন যাও। আমি বকবক করতে পারছি না।

কমলা এবার আর সহ্য করতে পারেন না। প্রায় চিৎকার করেই বলেন, এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?

ইউনিভার্সিটি থেকে রিহার্সাল দিতে গিয়েছিলাম।

কোথায় ?

একজন লেকচারারের বাড়ি।

উনি কোথায় থাকেন ?

ইউনিভার্সিটির কাছেই।

কমলা একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে বলেন, বেশ মিথ্যে কথা বলতে শিখেছ তো!

মালা এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েই চিৎকার করে, তুমি যাও। আমি তোমার সঙ্গে বকবক করতে পারব না।

কমলার মুখে আবার বিদ্রূপের হাসি ফুটে ওঠে। বলেন,

চমৎকার ! মেয়ে সারাদিন, সুমন্তদের ফ্ল্যাটে কাটিয়ে আবার আমাকে মেজাজ দেখাচ্ছে।

ওদিককার ঘর থেকে হঠাৎ বসন্তর গলা শোনা যায়—কমলা প্লীজ কাম টু মী !

মালা সঙ্গে সঙ্গে একটু চাপা হাসি হেসে বলল, যাও, যাও, বাপি তোমায় ডাকছেন। বোধহয় কোন জরুরী দরকার।

কমলা আর সহ্য করতে পারেন না। ঠাস করে মেয়ের গালে একটা চড় মেরেই বলেন, ডোণ্ট ফরগেট হি ইজ মাই হাসব্যাণ্ড ! আমি তোমাদের মত মধুচক্রের বৈঠকে নিজেকে বিলিয়ে দিতে শিখি নি।

মালা চড় খেয়েই চমকে ওঠে কিন্তু বিস্ময় কাটিয়ে কিছু বলার আগেই কমলা ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

কমলা নিজের ঘরে ঢুকেই দেখেন, নেশার ঘোরে বসন্ত ঘুমিয়ে পড়েছেন। বুঝতে পারেন, নেশার ঘোরেই উনি ওকে ডেকেছিলেন দরজা বন্ধ করে লাইট অফ করে কমলা শুয়ে পড়লেও ঘুমুতে পারেন না। বার বার শুধু রেখার কথাগুলো মনে হয়।......

কমলাদি, তোমাকে আমি শুধু ভালবাসি নি, শ্রদ্ধাও করি।

কমলা হেসে বলেন, হঠাৎ আমাকে শ্রদ্ধা করার কী কারণ ঘটল ?

শ্রদ্ধা করার অনেক কারণ আছে। কমলা সুন্দরী, শিক্ষিতা, আধুনিকা। ধনীর দুলালী। বহু বছর বিদেশে কাটিয়েছে। কত মানুষের সংস্পর্শে এসেছে জীবনে কিন্তু কোনদিনই ভেসে যায় নি। বসন্তরঞ্জন সরকারই ওর জীবনের একমাত্র পুরুষ। মিঃ সরকার এত বড় কোম্পানীর সেলস ম্যানেজার। কমলার বাবা এই কোম্পানীরই চেয়ারম্যান কিন্তু তার জন্য ওর কোন অহঙ্কার নেই। কেউ কোনদিন ওর মুখে শোনে নি, ওর বাবা চেয়ারম্যান বা ও কোনদিন বিদেশে ছিল। অথচ কমলা কত সহজ, সরল, প্রাণখুলে সবার সঙ্গে মেলামেশা করেন।

থাক, থাক, আর প্রশংসা করতে হবে না। কমলা হাসতে হাসতে বলেন, আমি চেয়ারম্যান হলে নিশ্চয়ই অহঙ্কার হতো কিন্তু বাবা চেয়ারম্যান বলে আমার ত কোন কৃতিত্ব নেই।

রেখাও হাসে। বলে, কমলাদি, তুমি ত আমাদের মত সাধারণ মেয়ে না ; তাই এসব কথা বলতে পারো।

আমি বুঝি অসাধারণ ?

একশ' বার।

রেখা মাঝে মাঝেই কমলার কাছে আসে। গল্পগুজব করে কাটিয়ে দেয় দু'এক ঘণ্টা। কখনও কখনও নিজের সুখ-দুঃখের কথাও বলে। সেদিন রেখা একটু অন্য সুরে কথা বলল।······কমলাদি, তুমি ত জানো আমাদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে কেউ কেউ আমার দেহটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে কিন্তু কপালের জোরে তেমন কোন বিপদে পড়িনি।

কমলা মাথা নেড়ে বলেন, তা তো বটেই।

তাই তো তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম।

বলো।

তুমি কিছু মনে করবে না ?

না, না, কিছু মনে করব না।

আমাকে ভুল বুঝবে না তো ?

কমলা হেসে বলেন, ভুল বুঝব কেন ?

রেখা এবার বলতে শুরু করে, অশেষের প্রমোশন হবার পর আমরা বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডের যে নতুন ফ্ল্যাটে গেছি, তার পিছন দিকের ফ্ল্যাটেই মিঃ ঘোষ বলে এক ভদ্রলোক থাকেন। শুনেছি, ভদ্রলোক বিশেষ ভাল না। তাই ওদের সঙ্গে অন্যান্য ফ্ল্যাটের লোকজনদের কোনো যোগাযোগ নেই।

কমলা জানতে চান, কেন ? ভদ্রলোক কী অপরাধ করেছেন ?

শুনি ভদ্রলোকের স্বভাব-চরিত্র অত্যন্ত খারাপ। রেখা একটু

হেসে বলে, বোধহয় চোখে চোখে রাখার জন্যই ভদ্রলোক ট্যুরে গেলেই ওঁর স্ত্রীও সঙ্গে সঙ্গে যান।

ভদ্রলোককে বুঝি খুব ঘুরতে হয়?

প্রত্যেক মাসে দশ-বারো দিন ত বাইরে থাকেনই।

ওদের কী ছেলেমেয়ে নেই?

কমলার প্রশ্ন শুনেই রেখার মুখের চেহারা বদলে যায়। গম্ভীর হয়ে বলে, হ্যাঁ, এক ছেলে, ছেলেটি এম এ পড়ে কিন্তু বাপের মত ওরও স্বভাব-চারিত্র ভাল না বলেই শুনি।

কমলা চুপ করে শোনেন। রেখা একবার ওর দিকে তাকায় তারপর বলে, মালাকে আজকাল প্রায়ই ঐ ছেলেটির সঙ্গে সারাদিন কাটাতে দেখছি।

কমলা অবাক হয়ে বলেন, কোথায়?

ঐ ফ্ল্যাটে।

কমলা উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করেন, তুমি ঠিক দেখছ?

হ্যাঁ কমলাদি, আমি ঠিকই দেখছি। রেখা একটু থেমে বলে, একদিন ত দেখি নি, আজকাল ত মালা দুপুর থেকে রাত সাড়ে আটটা-ন'টা পর্যন্ত সুমন্তর সঙ্গেই ····

কমলা এবার চিৎকার করে ওঠেন, সুমন্ত? ও কি তোমাদের পিছনের ফ্ল্যাটেই থাকে?

হ্যাঁ, আপনি ওকে চেনেন নাকি?

আস্তে আস্তে কমলা সব জানতে পারেন। সুমন্তর বাবা মা বাইরে গেলেই মালা ইউনিভার্সিটি থেকে ওখানে যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটায়। বুড়ো চাকরকে কোথায় যেন পাঠিয়ে দেয় সুমন্ত। তারপর?

না কমলাদি, সেকথা তোমাকে বলতে পারব না। তাছাড়া মালা তোমার মেয়ে। সেকথা তোমার না শোনাই ভাল।

রেখা না, অশেষই প্রথম মালাকে ঐ ফ্ল্যাটে দেখে। প্রথমে অশেষ

নিজের চোখকেই নিজে বিশ্বাস করতে পারে নি। আরো দু'তিন দিন দেখার পর সন্দেহ কেটে যায়। তারপর একদিন বাথরুমের জানালা দিয়ে সামনের দিকে তাকিয়েই অশেষ চমকে ওঠে। ছুটে বেরিয়ে এসে রেখাকে ডাক দেয়। রেখাকে নিয়ে বাথরুমে ঢুকেই অশেষ বলল, দেখেছ রেখা ঐ হতচ্ছাড়া ছেলেটা কিভাবে মালাকে জড়িয়ে শুয়ে আছে?

ও মালা? সরকারদার মেয়ে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও মালা।

রেখা ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না। অশেষ আর ও চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পর মালা বিছানা ছেড়ে উঠে শাড়ি পরতে গেলেই রেখা চমকে ওঠে, ঠিক বলেছ ত!

কে বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে? রেখা বলে, তুমি সরকারদাকে বলো।

অশেষ বলে, না, না, আমি ওকে এসব কথা বলতে পারব না, বরং তুমি······

পাগল হয়েছ? আমি সরকারদাকে এসব কথা বলতে পারি?

ইতিমধ্যে মিঃ ঘোষ স্ত্রীকে নিয়ে ফিরে আসেন। মালার আসা-যাওয়া বন্ধ হয়। দশ-বারোদিন পর আবার ওরা বাইরে যেতেই মালাকে বিকেলের দিকে সুমন্তর সঙ্গে শুয়ে থাকতে দেখা যায়। অশেষ আর রেখা স্থির থাকতে পারে না। এই ক'দিন মালাকে বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি করতে দেখেই শেষ পর্যন্ত রেখা কমলার কাছে ছুটে এসেছে।

রেখা যাবার সময় বলে, কমলাদি, তোমাকে খুবই দুঃখ দিলাম কিন্তু চোখের সামনে মালার এমন সর্বনাশ দেখতে পারছিলাম না বলেই ছুটে এসেছি।

বুকের ভিতর আগুন জ্বললেও কমলা অত্যন্ত ধীর-স্থিরভাবে বললেন, আজ বুঝলাম, তুমি সত্যিই আমাদের ভালোবাসো। অন্য কেউ হলে আমাদের না বলে কুৎসা রটিয়ে আনন্দ পেতো।

রেখা একটু ম্লান হেসে বলল, আজকাল পার্টিতে গেলে দু'তিন পেগ হুইস্কী খাই, অফিসাররা নাচতে নাচতে আমার শরীরের নানা জায়গায় হাত দিলে বা লুকিয়ে-চুরিয়ে কিস করলে প্রতিবাদ করি না ঠিকই কিন্তু তাই বলে কী ন্যায়-অন্যায় ভাল-মন্দ বিচার করতেও ভুলে গেছি ?

কমলা রেখাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, তুমি আমার একটা কথা রাখবে ?

রাখব না কেন ?

একটু কঠিন কাজ ; পারবে তো ?

যদি তুমি খুশি হও, তাহলে নিশ্চয়ই করব।

লক্ষ্মী রেখা, তুমি আর ড্রিঙ্ক করো না।

অনুরোধ শুনে রেখা অবাক হয়। জিজ্ঞেস করে, একেবারেই করব না ?

কমলা স্পষ্ট জবাব দেন, না।

রেখা অপলক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলে তোমাকে কথা দিচ্ছি. আমি আর ড্রিঙ্ক করব না কিন্তু তুমিও কথা দাও, আমাকে আর অশেষকে সব সময় শাসন করবে।

কমলা রেখাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলেন, অন্যায় করলে দুজনকেই মার দেব।

রেখা আনন্দে খুশিতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

তেরো

দক্ষিণ বাংলার প্রান্তসীমায় সমুদ্রকূলের পাশে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের এই বাংলোর খবর রাইটার্স বিল্ডিংএর বড় সাহেবরাও জানেন না। উনিশ শ' দশ-বারো সালের কথা। মিডল্যাণ্ড সাহেব তখন চীফ এঞ্জিনিয়ার। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে সাহেব প্রায়

পাগল। কার্শিয়াং-কালিম্পং থেকে হিমালয়ের সৌন্দর্য দেখে তিনি মুগ্ধ; উত্তরবঙ্গের বনানী দেখে আবার কর্ণফুলীর তীরে দাঁড়িয়ে সেই মিডল্যাণ্ড সাহেবই আত্মহারা। প্রায় সারা বাংলাদেশ ঘুরে দেখার পর রিটায়ার করার বছর খানেক আগে মিডল্যাণ্ড সাহেব দক্ষিণ বাংলার এই প্রান্তসীমায় এসে সমুদ্র আর বনানীর মিতালী দেখে আত্মহারা হয়ে গেলেন।

ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিলেন—বাংলো বানাও। দেখতে দেখতে বাংলো তৈরী হলো মিডল্যাণ্ড সাহেবের তদারকীতে।

তারপর রিটায়ার করার পর এই বাংলোয় পুরো একমাস কাটিয়ে মিডল্যাণ্ড সাহেব দেশে ফিরে গেলেন।

মিডল্যাণ্ড সাহেব চলে যাবার পর এ বাংলোর কথা সবাই ভুলে গেলেন।

কুড়ি-বাইশ বছর পরে ইরিগেশন ডিপার্টমেণ্টের নতুন চীফ এঞ্জিনিয়ার মিঃ গ্রীনস্ হঠাৎ একদিন তরুণ এঞ্জিনিয়ার মিঃ রায়কে নিয়ে এই বাংলোয় হাজির। গ্রীনস্ হাসতে হাসতে বললেন, জানো রায়, এই বাংলো আমার গ্রাণ্ডফাদার তৈরি করেছিলেন। আমার ওয়াইফ খিদিরপুরে ডকে নামার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিয়ে আমি এখানে চলে আসব ফর আওয়ার সেকেণ্ড হানিমুন।

মিঃ রায় হাসেন।

হাসছ কেন? তোমার বিয়ের পর তুমি এখানে হনিমুনে আসবে।

সত্যি, বছর দুই পরে মিঃ রায়ের বিয়ে হলে গ্রীনস্ সাহেবই উদ্যোগী হয়ে ওদের দুজনকে এখানে পাঠিয়ে দেন। সে অবিস্মরণীয় আনন্দের স্মৃতি উনি আজও ভোলেন নি। তাই তো জীবন সায়াহ্নে এসেও সপত্নীক মিঃ রায় বছরে একবার এখানে আসবেনই।

এবার ছেলে-পুত্রবধূ বা নাতি-নাতনী সঙ্গে আসে নি। সঙ্গে এনেছেন মেয়ে সীতাকে। কথা ছিল জামাইও আসবেন কিন্তু অফিসের কতকগুলি জরুরী কাজে ব্যস্ত থাকায় তিনি আসতে পারেন নি।

সীতা এখানে বহুবার এসেছে। সেই ছোটবেলা থেকেই আসছে কিন্তু এতবার এলেও কখনও খারাপ লাগে না। তাইতো দাদা-বৌদি না এলেই সীতা বাবার সঙ্গে চলে আসে বাবা এখন আর ঘুরে-ফিরে বেড়ান না; ঘরে বা বারান্দায় শুয়ে-বসে কাটিয়ে দেন কটা দিন। সীতা ঘুরে বেড়ায় চারদিকে। কখনও হাঁটতে হাঁটতে ঐ দূরের সমুদ্রের কাছে চলে যায়; কখনও বা ঘুরে বেড়ায় বনে বনে। আবার কখনও চৌকিদারের ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে গল্প করে।

মিঃ রায় ঘরে বসে বই পড়ছিলেন। সীতা পশ্চিম দিকের বারান্দার বসে ছোটবেলার কথা ভাবে। এই বারান্দায় বসে বসেই ওরা দু' ভাইবোনে মার কাছে গল্প শুনত। কখনও আবার ভাইবোনে লুডো খেলত। একটু বড় হবার পর ভাইবোনে ঘুরে বেড়াত সমুদ্রের ধারে বা পূব দিকের জঙ্গলে একবার ঐ জঙ্গলে ওর দাদা কি সুন্দর একটা পাখির বাচ্চা ধরেছিল কিন্তু মার বকুনির জন্য বাচ্চাটিকে ঐ জঙ্গলে ছেড়ে আসে। আরো কত কথা মনে হয় সীতার।

হঠাৎ একটা গাড়ির শব্দ শুনেই সীতা চমকে ওঠে। ভাবে, বোধ হয় দাদা-বৌদিরা এসেছে। আবার ভাবে, ওরা ওর ... ওর স্বামীকেও ধরে এনেছে। চেয়ার ছেড়ে পূবদিকের বারান্দায় যেতেই সীতা দেখে, না, অন্য এক ভদ্রলোক এ দিকেই এগিয়ে আসছেন। ভদ্রলোক একটু কাছে আসতেই সীতা ভাল করে দেখে। না, ওদের চেনাজানা কেউ না।

ভদ্রলোক বারান্দায় পা দিয়েই থমকে দাঁড়ান। মুহূর্তের জন্য অপলক দৃষ্টিতে সীতাকে দেখেন। সীতা লজ্জায় নিজেকে গুটিয়ে নিয়েও চলে যায় না। জিজ্ঞেস করে, আপনি কাউকে চান?

ভদ্রলোক এবার ওর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলেন, সীতা, তুমি!

হ্যাঁ কিন্তু......

আমাকে চিনতে পারছ না?

সীতা একবার ভাল করে ওকে দেখে বলে, চেনা চেনা মনে হচ্ছে কিন্তু...

ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বলেন, হঠাৎ বড্ড মোটা হয়ে গেছি বলে...

না, না, সীতা আর ভুল করে না। একটু হেসে বলে, তুমি স্বহাস।

উনি হেসে বলেন, হ্যাঁ।

হঠাৎ দক্ষিণের সমুদ্রের আচমকা হাওয়ায় ওদের উড়িয়ে নিয়ে যায় বিস্মৃতপ্রায় অতীতে। কয়েক মিনিট কেউই কোন কথা বলেন না, বলতে পারেন না।

স্বহাসই প্রথম কথা বলেন, জ্যেঠু এসেছেন নাকি ?

হ্যাঁ।

কবে এসেছ ?

কাল বিকেলে।

ক'দিন থাকবে ?

শনিবার বিকেলে দাদা গাড়ি পাঠাবে! এবার সীতা প্রশ্ন করে, হঠাৎ তুমি এখানে এলে ?

স্বহাস হেসে বলেন. তোমাকে না পেয়ে আমি কত খারাপ হয়েছি, বোধহয় সে কথা তোমাকে জানাবার জন্য হঠাৎ এখানে চলে এলাম।

সীতা অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি খারাপ হতে পারো না।

সীতা, কোনদিন কী ভেবেছিলাম তোমাকে অমন করে পেয়েও আমার জীবন থেকে হারিয়ে যাবে ? স্বহাস হেসে বলেন, যা ভাবা যায় না, তাইতো জীবনে ঘটে।

সীতা একটু চুপ করে থাকার পর বলে, চলো. বাবার সঙ্গে দেখা করবে।

স্বহাস প্রশ্ন করতেই মিঃ রায় অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, কে ?

সুহাস কিছু বলার আগেই সীতা হাসতে হাসতে বলে, চিনতে পারলে না বাবা ?

না।

এবারও সীতা বলে, মল্লিক কাকুর ছেলে সুহাসদা।

এবার মিঃ রায় হেসে বলেন, তুই মল্লিকের ছেলে! তা এত মোটা হলি কি করে ?

সুহাস হেসে বলেন, হ্যাঁ, হঠাৎ মোটা হয়ে গেলাম।

মল্লিক কোথায় ?

বাবা-মা কাশীতে থাকেন।

আর তোর দিদি রামুর কী খবর ?

দিদি ভালই আছে। জামাইবাবু এখন চণ্ডীগড়ে আছেন।

তুই কী করছিস ?

আমি ফিল্মের ব্যবসা করছি।

ফিল্ম. মিঃ রায় অবাক হন।

সীতা সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে, আজকাল যে মল্লিক প্রোডাকসন খুব ছবি করছে তাকি তোমার ?

সুহাস হেসে বলেন, হ্যাঁ

তুমি অধ্যাপক হওনি ? সীতার কথায় কেমন যেন একটা চাপা দুঃখের ইঙ্গিত।

সুহাস মাথা নেড়ে বলেন. না।

তুমি এখন খুব বড়লোক হয়েছ, তাই না সুহাসদা ?

উনি জবাব দেবার আগেই মিঃ রায় বলেন, আমরা তো ভেবেছিলাম, তুই খুব নামকরা প্রফেসর হয়েছিস্।

না জ্যেঠু, তা আর হতে পারলাম না।

কলকাতাতেই আছিস ত ?

হ্যাঁ।

হঠাৎ এখানে এলি কী মনে করে ?

আমার একটা ছবির স্যুটিংএর জন্য এই এলাকায় দু'দিন ধরে ঘুরছিলাম। জায়গা-টায়গা পছন্দ করার পর ডিরেক্টর আর ক্যামেরা ম্যানকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে হঠাৎ মনে হলো এই বাংলোয় একরাত কাটিয়ে কলকাতা ফিরব।

মিঃ রায় একটু হেসে বললেন, ছোটবেলায় তুই আর রানু ত সব সময় আমাদের সঙ্গে এখানে আসতি।

সুহাস হেসে বলেন হ্যাঁ। একটু থেমে একবার সীতার দিকে তাকিয়ে বললেন, সেই কথা মনে করেই ত চলে এলাম।

সীতা একটু হেসে জিজ্ঞেস করল, সেসব দিনের কথা তোমার মনে আছে?

জ্যেঠুর কাছে ধরা পড়ার ভয়ে সুহাস খুব স্বাভাবিকভাবে জবাব দেন, কেন থাকবে না?

এবার মিঃ রায় মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলেন মধুকে একটা ঘর খুলে দিতে বল। আর ওকে কিছু খেতে-টেতে দেবার ব্যবস্থা কর।

না জ্যেঠু, এখন আর কিছু খাব না। একেবারে দুপুরবেলায় আপনাদের সঙ্গে ভাত খাব।

দুপুরে খেতে বসে কত গল্প হলো তিনজনে। অনেক দিন পর অনেক কথা মনে পড়ল তিনজনের। তারপর মিঃ রায় বললেন, কলকাতাতেই আছিস অথচ যোগাযোগ রাখিস না কেন?

সুহাস বলতে পারে না, জ্যেঠু, খোকনদা আমাকে এমন অপমান করে আপনাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল যে……। না, সুহাস সে কথা বলেন না। বলেন, লেখাপড়া ছেড়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে লেগে পড়ায় আজকাল আর কারুর সঙ্গেই যোগাযোগ রাখতে পারি না।

যাই হোক, এখন থেকে মাঝে মাঝে আসিস। তোদের দেখলেও ভাল লাগে।

হ্যাঁ জ্যেঠু, আসব।

মিঃ রায় খাওয়া-দাওয়ার পর আর বসতে পারেন না: শুয়ে পড়েন। সীতা আর সুহাস ওদিকের বারান্দায় বসে গল্প করে।

তুমি বিয়ে করেছ?

সুহাস হেসে বলেন, হ্যাঁ।

কবে?

অনেক দিন।

কী নাম তোমার বউয়ের?

সীতা।

বাজে কথা বলো না।

সত্যি বলছি।

সত্যি তোমার বউয়ের নাম সীতা?

হ্যাঁ।

খুব সুন্দরী বুঝি?

আমার চোখে ত সুন্দরীই মনে হয়।

সীতা একটু চুপ করে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ায় কিছুক্ষণ। তারপর আবার প্রশ্ন করে, ক'টি ছেলেমেয়ে?

সুহাস হেসে বলেন, কেন হয় নি তা সীতাই জানে। উনি এবার জানতে চান, তোমার ছেলেমেয়ে হয়েছে?

না।

কেন?

সীতা একটু হেসে বলে, তা কি করে বলব?

উত্তর দিতে লজ্জা করছে?

তোমার কাছে লজ্জা করব কেন?

তাহলে সত্যি কথাটাই বলো।

সীতা সুহাসের দিকে তাকিয়ে একটু আনমনা হয়ে কি যেন ভাবে। লুকিয়ে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে একটু ম্লান হেসে বলে, তোমাকে না পেয়ে যাকে পেয়েছি, তার মত স্বামী হয় না।

সুহাসের খট্‌কা লাগে কিন্তু কথা বলে না। সীতার দিকে চেয়ে থাকে অপলক দৃষ্টিতে।

সীতা হেসে বলে, আমার স্বামী বিখ্যাত কোম্পানীর পারচেজ ম্যানেজার। শত শত সাপ্লায়ার তাকে খুশি করার জন্য পাগল।

মিঃ চৌধুরী বুঝি খুব ঘুষ নেন?

না, এক পয়সাও ঘুষ নেয় না। সীতা আবার একটু হেসে বলে, তবে নিত্য মদ্যপান ও নিয়মিত নারী উপভোগ করে মাঝরাত্তিরের পরে যখন বাড়ি ফেরেন······

শুনেই সুহাসের কষ্ট হয়। বলে, তুমি কিছু বল না?

না।

কেন?

যে আমাকে ভালবাসে না, যে আমাকে চায় না, তার কাছে দাবী জানিয়ে কী লাভ?

তাই বলে তুমি চুপ করে সহ্য করবে?

উপায় কী? কোথায় যাব? দাদা-বৌদির কাছে? সীতা কোনমতে চোখের জল আটকে বলে, ওরা বাবাকেই রাখতে চায় না। ও হঠাৎ হেসে বলে, তুমি আমাকে সিনেমায় চান্স করে দাও না।

সুহাস মাথা নেড়ে বলে, না।

কেন?

ওখানে এত হাঙর-কুমীর যে দু'দিনেই তোমাকে খেয়ে ফেলবে।

ফেলুক! তবু ত পয়সা হবে, নাম হবে!

আমি তোমার এত উপকার করতে পারব না।

হঠাৎ সীতা উত্তেজিত হয়ে বলে, কেন পারবে না? আমি কী তাহলে এভাবে তিলে তিলে মরব?

না।

তবে কী করব? ঐ মাতাল-চরিত্রহীনের সঙ্গে অভিনয় করে জীবন কাটাব?

না। হঠাৎ সুহাস হেসে বলে, আমার বউয়ের ছবি দেখবে ?

দেখব বৈকি।

রাগ করবে না ত ?

রাগ করব কেন ?

হিংসা হবে না ?

সীতা একটু বিরক্ত হয়েই বলে, অং কৈফিয়ত দিয়ে তোমার বউয়ের ছবি দেখতে চাই না।

সুহাস হাসতে হাসতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সীতার হাত ধরে বলে, ঘরে চলো ; ছবি দেখাচ্ছি।

সুহাস ঘরে ঢুকে সুটকেসের ভিতর থেকে পার্স বের করে ওর সামনে খুলে ধরতেই সীতা চমকে ওঠে, সুহাসদা !

চৌদ্দ

স্নেহের বোন সীতা,

আমরা সোমবার বোম্বে এসেই দেখি, ঐদিন সকালেই মালা আর জয়ন্ত কাশ্মীরে হনিমুন সেরে ফিরে এসেছে। দু'জনে খুব খুশি। মঙ্গলবার সারাদিন জিনিসপত্র গুছিয়ে দিয়েছি। রাত্রে বাবা একটা পার্টি দিলেন। অনেকেই এসেছিলেন। সবাই জয়ন্তকে দেখে খুশি। বুধবার ওদের প্লেনে চড়িয়ে দিয়ে আসার পর মন বড়ই খারাপ হয়েছিল। আজ সকালে লণ্ডন থেকে ওরা ফোন করেছিল। ওদের সঙ্গে কথা বলে খুব ভাল লাগল। তারপর দুপুরের ডাকে হঠাৎ তোমার চিঠি পেলাম ও সব জানলাম।

তুমি জানো, আমি আর বসন্ত দুজনেই চৌধুরীকে সংযত করার বহু চেষ্টা করেছি কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন বুঝলাম, ওর কোন পরিবর্তন হবে না, তখনই তোমাকে নিজের পথ দেখতে বলেছিলাম। এতদিন

তোমার বাবা বেঁচে ছিলেন বলে তুমি প্রকাশ্যে সব কথা বলতে পারো নি কিন্তু এখন আর ভয় কী? চরিত্রহীন লম্পট স্বামীর প্রতি তোমার কোন দায়িত্ব-কর্তব্য নেই। তুমি ঠিকই সিদ্ধান্ত নিয়েছ। তুমি সত্যি সত্যি হাসি মুখে অনেক দুঃখ, অনেক অবিচার সহ্য করেছো। আর প্রয়োজন নাই। আমরা জানি তোমরা সুখী হবেই।

সব শেষে বলি, মা-বাবা নেই বলে দুঃখ করছ কেন? আমি তো আছি। আমি কী তোমার দিদি না?

তোমরা দুজনে আমার প্রাণভরা ভালবাসা নিও।

—তোমাদের কমলাদি

মাই ডিয়ার সুহাস,

সুহাস মল্লিক প্রযোজিত সীতা প্রডাকসন্সের প্রথম ছবি আমার পরিচিত নার্সিং হোমে নিয়ে গিয়ে সামনের বছর রিলিজ করতে হবে।

—বসন্তদা

হাকিম

সবার মুখেই এক কথা। পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে, স্কুল-কলেজে, অফিসে-আদালতে। সর্বত্র। এমন কি হরিসভা-কালী-বাড়িতেও ঐ এক কথা। ছোট্ট মফঃস্বল শহর যে! এখানে সবাই হাঁড়ির খবর রাখে। কিছু চাপা থাকে না।

এই যে হরিপদ উকিলের বিধবা মেয়ের বাচ্চা হবে, তাও কি চাপা থাকল? এ শহরের কে না জানে নিউ স্পোর্টিং ক্লাবের রাইট আউট পলাশদার সঙ্গে পারুলের ভালবাসা ছিল? গভর্নমেণ্ট প্লিডার সতীশ ঘোষাল কি চেপে রাখতে পারলেন ছেলের বিয়েতে নগদ নেবার খবর? এ শহরের সবাই জেনে গেছে সতীশবাবু ছেলের বিয়েতে অনেক দর কষাকষির পর তিরিশ হাজার নগদ নিয়েছেন। তবে এ কথাও সবাই জানে যে নগদ নেবার বিষয়ে সুব্রত কিছুই জানত না এবং এ নিয়ে ফুলশয্যার পরদিনই বাপের সঙ্গে ছেলের এক চোট হয়ে গেছে। জীবন মিত্তিরের বউ বলছিলেন, সুব্রত বউকে নিয়ে হয়ত আলাদা হয়ে যাবে।

এই তো উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বেরুবার এক ঘণ্টার মধ্যে ঘরে ঘরে পৌঁছে গেল, মধুমিতা সাতশ একুশো নম্বর পেয়ে নবম স্থান দখল করেছে। সবাই এমন ভাবে বলাবলি করছিল যে, মধুমিতা যেন ওদের বাড়িরই মেয়ে! আবার হাইওয়ের ইঞ্জিনিয়ার অসিতবাবুর মেয়ে শিউলি যে এবারও ফেল করেছে, সে খবরও ছড়াতে সময় লাগল না। দুটো খবরের জন্যই যেন শহরের লোক খুশি। কেউ বললেন, অত ঘুষ খেলে আর ছেলেমেয়ের লেখাপড়া হয় না। অল্পবয়সী মেয়ে-বউরা বলাবলি করলেন, যে মেয়ের এত অহংকার আর রূপের বড়াই, তার আবার লেখাপড়া হবে? কচু হবে।

সবার সব ব্যাপারেই শহরের মানুষের মাথাব্যথা। এঁদো ডোবায় ছোট্ট ঢিল পড়লেও যেমন হয় আর কি। তাইতো কোর্টে পিটিশন জমা পড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সারা শহরে রটে গেল, জয়ন্ত প্রফেসার সবিতাকে ডিভোর্স করছেন।

'পথে-ঘাটে, হাটে বাজারে মুখোমুখি দু'জনের দেখা হলেই হলো।

এই যে যতীনবাবু, আপনাদের কলেজের জয়ন্ত তাহলে সত্যি সত্যি স্ত্রীকে ডিভোর্স করছেন ?

যতীনবাবু কলেজের হেড ক্লার্ক। তিনি একটু হেসে বললেন, শুধু ডিভোর্স কেন, আরো অনেক কিছু হবে।

বলাই মাস্টার বকের মত গলা বাড়িয়ে যতীনবাবুর মুখের কাছে মুখ নিয়ে ভুরু নাচিয়ে মৃদু হেসে একটু চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, আরো অনেক কিছু মানে ?

—ঠিক জানি না, তবে শুনছি, আমাদেরই কলেজের একজন লেকচারারকে বিয়ে করবেন।

—কে বিয়ে করবেন ? প্রফেসার ? নাকি তাঁর স্ত্রী।

—কে আবার ? প্রফেসার।

—তাই নাকি ?

—সেই রকমই তো শুনছি। মিস চক্রবর্তীর সঙ্গে তো জয়ন্ত-বাবুর খুব ভাব।

—তাই বলুন।

হরপ্রসাদ মুখুজ্জের তাসের আড্ডায় উকিল ছটাই গাঙ্গুলী এক টিপ নস্যি নিয়েই বললেন, ডিভোর্স স্যুট যে আজকালের মধ্যেই ফাইল হবে, তা কি আমরা জানতাম না ?

দু'তিনজন একসঙ্গে বলে উঠলেন, জানতেন ?

—জানব না কেন ?

—কি করে ? শ্রীনাথ কম্পাউণ্ডার প্রশ্ন করলেন।

ছটাই গাঙ্গুলী ময়লা এক টুকরো ন্যাকড়া দিয়ে নাক পরিষ্কার করেই বললেন, এই হরপ্রসাদকে আমি আগেই বলেছিলাম, জয়ন্ত প্রফেসার বউকে দু'বছর দূরে কোথাও সরিয়ে রাখার পরই ডিভোর্স স্যুট ফাইল করবে।

কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের হেড ক্যাশিয়ার মদন দত্ত চারমিনারে একটা টান দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বউকে দু'বছর সরিয়ে রাখার দরকার কি ছিল? এর আগেও তো ডিভোর্স স্যুট ফাইল করা যেত।

ছটাই গাঙ্গুলী ওকালতিতে পসার জমাতে না পারলেও আইনের প্যাঁচ বোঝে। উনি একটু ব্যঙ্গ হাসি হেসে বললেন, স্পেশ্যাল ম্যারেজ অ্যাক্ট অফ নাইনটিন ফিফটি ফোরের ক্লজ টোয়েন্টি সেভেনের এই সাব ক্লজেই ডিভোর্স পাওয়ার ঝামেলা সব চাইতে কম।

মদন দত্ত আর কোন প্রশ্ন না করলেও উনি বলেন, যদি স্বামী-স্ত্রী দু'জনে এক মত হয়ে ডিভোর্স চায় তো আলাদা ব্যাপার। তাছাড়া এককভাবে যে পক্ষই ডিভোর্স চাক, কম-বেশি ঝামেলা আছেই। হেমন্তদার বুদ্ধিতেই জয়ন্ত প্রফেসার দু'বছর বউকে বাপের বাড়িতে ফেলে রেখেছে।

এতক্ষণ চুপচাপ সবকিছু শোনার পর হরপ্রসাদ বললেন, জয়ন্ত যখন হেমন্তদার মত উকিল ধরেছে, তখন ডিভোর্স তো পাবেই, তাই না ছটাই?

ছটাই গাঙ্গুলী গম্ভীর হয়ে বললেন, হেমন্তদা নিশ্চয়ই ভাল উকিল কিন্তু প্রফেসার ডিভোর্স পাবেই, এ কথা বলা মুশকিল।

—কেন?

—প্রফেসারের স্ত্রী যদি প্রমাণ করে যে, আর একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করার জন্যই তাকে সরিয়ে রাখা হয়েছিল, তাহলে কোর্ট কিছুতেই ডিভোর্স গ্রান্ট করবে না।

হরপ্রসাদ মুখুজ্জে মাথা নেড়ে বললেন, তা ঠিক।

ছটাই গাঙ্গুলী একটু হেসে বললেন, তাছাড়া আমাদের শ্রীমতী হাকিম বড় কড়া মেয়ে। উনি ঠোঁট উল্টে বললেন, বিশেষ করে মেয়েদের ব্যাপারে এ হাকিমকে সহজে বোঝানো মুশকিল।

মদন দত্ত সঙ্গে সঙ্গে বললেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মনোরমা পিসির মামলায় এমন রায় দিলেন যে থানার দারোগা থেকে বাজারের অতগুলো দোকানদার ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

শ্রীমতী শীলা চৌধুরী এ শহরে হাকিম হয়ে এসেছেন মাত্র মাস ছয়েক আগে, কিন্তু এরই মধ্যে সবাই টের পেয়েছে, একটু এদিক-ওদিক হলে আর নিস্তার নেই। আগে উকিলবাবুরা সামান্য একটা ছুতো পেলেই বলতেন, ইওর অনার, এই ক'দিনের মধ্যে অতগুলো ডকুমেণ্ট পরীক্ষা করা সম্ভব হয় নি। সুতরাং আমাকে আরো দু'সপ্তাহ সময় দেওয়া হোক। আগে এক কথায় সেদিনের শুনানী মুলতুবি রেখে পরের মাসের বারো তারিখে দিন পড়ত। আর এখন?

শ্রীমতী চৌধুরী গম্ভীর হয়ে বললেন, লার্নেড অ্যাডভোকেট, মামলার গত শুনানীর দিনই জানতেন কত দিনের মধ্যে কতগুলি ডকুমেণ্ট পরীক্ষা করতে হবে? তখন অসুবিধার কথা জানালে অনায়াসে লার্নেড অ্যাডভোকেটকে আরও বেশি সময় দেওয়া যেত, কিন্তু আজ যখন উভয় পক্ষের এতগুলি লোক অন্য সব কাজ ফেলে কোর্টে এসেছেন, তখন আজ শুনানী স্থগিত রাখার কোন কারণ নেই।

উকিলবাবু চুপ!

শ্রীমতী চৌধুরী সব শেষে বলবেন, এইভাবে মামলার শুনানী হরদম স্থগিত রাখলে উভয় পক্ষেরই অর্থ ও কোর্টের সময় নষ্ট হয়!

এক কথায়, শীলা চৌধুরী এখানে হাকিম হয়ে আসায় সব উকিলবাবুই বুঝেছেন, শুধু মামলার শুনানী স্থগিত রেখে মক্কেলদের কাছ থেকে ফী আদায়ের দিন শেষ।

শুধু উকিলবাবুরা কেন, থানার দারোগাদের অবস্থাও সঙ্গীন।

গভর্নমেণ্ট প্লিডার সতীশ ঘোষাল যেই বললেন, তদন্তকারী অফিসার এই দু'মাসের মধ্যে তদন্ত শেষ করতে পারেন নি বলে ইওর অনার যদি অনুগ্রহ করে আরো দু'মাস—

সঙ্গে সঙ্গে শীলা চৌধুরীর মুখের চেহারা বদলে গেল। বললেন, আমি আশা করি নি থানার ইন্সপেক্টরের মত উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার এই মামলার ব্যাপারে এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন ও অকর্মণ্যতার পরিচয় দেবেন। মানুষ ন্যায়-বিচারের জন্য আদালতে আসে কিন্তু এই ধরনের অপদার্থ পুলিশ অফিসারদের গাফিলতির জন্য বহু মানুষকেই অযথা দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়। যাই হোক, আগামী সোমবার আদালতে তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতেই হবে। অন্যথায় কোর্ট অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হবে।

এই হাকিম শীলা চৌধুরীর কোর্টেই জয়ন্ত প্রফেসারের ভাগ্য নির্ণয় হবে।

এই শহরে একটাই কলেজ। তাও বেশি দিনের নয়। মাত্র বছর দশেক আগে চালু হয়। প্রথমে শুধু আর্টস; পরে কমার্স। এখনও এখানে বিজ্ঞান পড়াবার ব্যবস্থা নেই। এই শহরে এই একটাই কলেজ বলে ছেলেমেয়ে দুই-ই পড়ে একসঙ্গে। দেড়শো-দুশো ছাত্রী আছে বলে বেশ কয়েকজন অধ্যাপিকাও আছেন। মিস তপতী চক্রবর্তী তাঁদেরই একজন।

তপতী ইতিহাসের লেকচারার। এম. এ-তে ফার্স্ট ক্লাস পান নি কয়েক নম্বরের জন্য। তাই অধ্যাপনা শুরু করেন ডায়মণ্ডহারবারের কাছাকাছি একটা ছোট্ট কলেজে। সেখানে দেড় বছর অধ্যাপনা করেই এখানে এসেছেন।

তপতীর বয়স বছর তিরিশেক হবে। দীর্ঘাঙ্গী, শ্যামবর্ণা। চোখ দু'টি খুব বড় না হলেও বেশ উজ্জ্বল। ঐ দু'টি উজ্জ্বল প্রাণবন্ত চোখের জন্যই সব সময় মনে হয়, হাসছেন। কথাবার্তা মেলামেশায়

কোন জড়তা নেই কিন্তু কখনই কারুর সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ হতে চান না। খুব ভাল অধ্যাপিকা বলে নয়, শুধু ওঁর ব্যবহারের জন্যই উনি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়।

শুধু ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই নয়, কলেজের ম্যানেজিং কমিটি ও শহরের বহুজনের মধ্যেই উনি জনপ্রিয়। নিউ স্পোর্টিং ক্লাবের প্রাক্তন গোলকীপার লাট্টুদা বিড়ি টানতে টানতে বলেন, অমন কাঁচা-মিঠে যুবতীকে কে না ভালবাসবে?

লাট্টুদা এখন হতাশায় ভুগছে বলে যার তার সম্পর্কে যা তা বলেন, তবুও কথাটার মধ্যে খানিকটা সত্যতা আছে। তপতী এখানে আসার পর কলেজের ম্যানেজিং কমিটির দু'তিনজন সদস্য ওঁর ব্যাপারে এমন উৎসাহী হয়ে উঠলেন যে সারা শহরের মানুষ হাসাহাসি করত।

এক কথায় এ শহরের অনেকেই তপতীকে নিয়ে দিবাস্বপ্ন দেখেন এবং কলেজের ম্যানেজিং কমিটির দু'তিনজন সদস্য, লেকচারার ও সদর হাসপাতালের একজন ডাক্তার ওঁর দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন। সব সুন্দরী যুবতীদের মত তপতীও তাঁর সব অনুরাগীদের অগ্রাহ্য করে মন দিলেন অধ্যাপক জয়ন্ত রায়কে।

তপতী আসার পরের বছর জয়ন্তবাবু এই কলেজে যোগ দেন ইংরেজির লেকচারার হয়ে। এই কলেজে যোগ দেবার আগে উনি আরো দু'টি কলেজে কাজ করেছেন। পড়ান ভাল কিন্তু ওঁর এমন একটা অহমিকা ভাব আছে যে কেউই ওঁকে বিশেষ পছন্দ করেন না। অহমিকা হবার অবশ্য একটু কারণ আছে। একে কলকাতার ধনী পরিবারের ছেলে, তার পর পড়াশুনা করেছেন প্রেসিডেন্সিতে। তাছাড়া দু'এক মাস পর পরই স্টেটসম্যানে ওঁর লেখা বেরোয় ও কলকাতা রেডিও থেকে ইংরেজি 'টক' দেন। এই শহরে আর এমন কেউ নেই, যিনি এই দুটি কৃতিত্ব অর্জন করেছেন এবং সেইজন্যই বোধহয় আভিজাত্যের বেড়াজালে উনি নিজেকে বন্দী রাখেন।

জয়ন্তবাবুর স্ত্রী সবিতা শান্তিনিকেতনের সঙ্গীত ভবনের ছাত্রী ছিলেন ; তবে গানে নয়, নাচে। শোনা যায়, চিত্রাঙ্গদায় ওঁর নাচ দেখেই জয়ন্তবাবু নিজের ভাগ্য ওঁর হাতে সঁপে দেন। বিয়ের বছর-খানেক পরেও উনি একবার নিউ এম্পায়ারে চিত্রাঙ্গদার ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়েছিলেন। তারপর ছোটখাট অনুষ্ঠানে নাচলেও এখন আর নাচেন না। আলাপ-ব্যবহার ও রুচিতে সবিতার তুলনা হয় না কিন্তু পড়াশুনার ব্যাপারে ওঁর বিশেষ আগ্রহ কম। শুধু নাচ-গান ছাড়া আর কোন বিষয়েই উনি কথাবার্তা বলতে উৎসাহী না। তা হোক, সব মিলিয়ে সবিতাকে নিয়ে জয়ন্তবাবু বেশ সুখীই ছিলেন।

সেবার শান্তিনিকেতনের বসন্তোৎসবে যাবার সময় সবিতা প্রায় জোর করেই তপতীকে নিয়ে গেলেন। জয়ন্ত সঙ্গে ছিলেন। বসন্তোৎসবে যাবার সময় সবিতা শান্তিনিকেতনে থেকে গেলেন দু'এক সপ্তাহের জন্য। কলেজ খোলা ছিল বলে জয়ন্ত আর তপতী ফিরে এলেন এখানে।

শান্তিনিকেতন থেকে ফেরার পথে কি যেন ঘটে গেল ওঁদের জীবনে। এখানে ফিরে আসার পর পরদিনই ঘনিষ্ঠতা বাড়তে শুরু করল। সবিতা ফিরে আসার পরও ঘনিষ্ঠতা কমল না, বরং আরোও বাড়ল। শনি-রবিবার তপতী এঁদের এখানেই থাকেন। কেউই কিছু সন্দেহ করে নি। তারপর হঠাৎ একদিন সবিতা এখান থেকে চলে গেলেন কলকাতায় কিন্তু তখনও কেউ কিছু রহস্য আন্দাজ করতে পারেন নি।

মাসের পর মাস কেটে যায় কিন্তু সবিতা ফিরে আসেন না। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলেই জয়ন্তবাবু বলেন, ও এখন ছাত্রীদের নাচ শেখাতে এমনই মেতে গেছে যে তাদের ছেড়ে আসতে চায় না। তাছাড়া আমি তো মাঝে মাঝেই কলকাতায় যাচ্ছি।

সেই সবিতার সঙ্গে ডিভোর্স !

ছোট্ট শহরের একমাত্র কলেজের একজন অধ্যাপকের ডিভোর্সের

মামলা যেদিন কোর্টে উঠল, সেদিন সারা শহরের লোক ভেঙে পড়ল। অনেকেই ভেবেছিলেন, একদিনেই মামলা শেষ হবে কিন্তু ঘটনাচক্রে দ্বিতীয় দিন মামলা হঠাৎ নাটকীয় মোড় নিল।

তিন দিনের দিন সবিতার পক্ষে অধ্যাপক জয়ন্ত রায়কে জেরা করার জন্য কলকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিস্টার শঙ্করদাস মুখার্জী কোর্টে হাজির হতেই হেমন্ত উকিলের পিলে চমকে উঠল।

ব্যারিস্টার শঙ্করদাস মুখার্জী জয়ন্তবাবুকে জেরা করতে উঠেই প্রথম প্রশ্ন করলেন—আপনার নাম ?

—শ্রীজয়ন্ত রায়।

—ঠিক বলছেন ?

উনি একটু রেগেই জবাব দিলেন, সারা পৃথিবী জানে আমার নাম জয়ন্ত রায়।

রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মত গর্জে উঠে শঙ্করদাস বললেন, আপনি আইনস্টাইন বা রবীন্দ্রনাথ না যে সারা পৃথিবী আপনার নাম জানবে। আমি আবার প্রশ্ন করছি, আপনার নাম কি ?

—শ্রীজয়ন্ত রায়।

ব্যারিস্টার সাহেব একটু হেসে অত্যন্ত মিহি সুরে বললেন, সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আপনি সত্য কথা বলতে অঙ্গীকারবদ্ধ, তা জানেন ?

—জানি।

—মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার জন্য শাস্তি আছে, তা জানেন ?

—শুনেছি।

—তাহলে আমি ও মাননীয় এই কোর্ট বিশ্বাস করতে পারি আপনার নাম শ্রীজয়ন্ত রায়, তাই তো ?

—হ্যাঁ।

এবার ব্যারিস্টার সাহেব হাকিম শীলা চৌধুরীর হাতে দুটি কাগজ দিয়ে বললেন, ইওর অনার, ঐ কাগজ দুটি হচ্ছে জয়ন্তবাবুর ঠিকুজি-

কোষ্ঠী ও বি. এ-র সার্টিফিকেটের ফটো-কপি এবং ঐ দুটি থেকেই জানা যায় সাক্ষীর নাম শ্রীজয়ন্তভূষণ রায়—শুধু জয়ন্ত রায় নয়।

এবার উনি চোখের নিমেষে ঘুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে সাক্ষীকে বললেন, আপনি কোর্টে হলপ নিয়েও নিজের নামটি পর্যন্ত ঠিক বলেন নি। অর্থাৎ ইওর অনার, উইটনেস ইজ এ লায়ার! মিথ্যাবাদী।

হেমন্তবাবু একটু ক্ষীণ প্রতিবাদ করলেই শঙ্করদাস মুখার্জী ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন, আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুর এটুকু আইনজ্ঞান নিশ্চয়ই আছে যে নামের সামান্য পরিবর্তন করতে হলেও কোর্টে আসতে হয় ও কোর্টের অনুমতি পাবার পর বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জনসাধারণকে জানাতে হয়।

ঐ এক প্রশ্নেই কোর্টের আবহাওয়া ঘুরে গেল। জেরা এগিয়ে চলে।

—আচ্ছা জয়ন্তভূষণ...

ব্যারিস্টার সাহেব জয়ন্তভূষণ বলতেই কোর্টের সবাই হো-হো করে হেসে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাকিম শীলা চৌধুরী বললেন, অর্ডার! অর্ডার! কোর্টের মধ্যে কেউ গণ্ডগোল করবেন না।

কোর্ট-রুম শান্ত হতেই ব্যারিস্টার সাহেব কয়েকটি মামুলি প্রশ্ন করার পরই জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা জয়ন্তভূষণ, আপনি কি কোনদিন কবিতা লিখেছেন।

—ছাত্রজীবনে কয়েকটি কবিতা লিখেছি।

—কি নিয়ে লিখেছিলেন, তা কি মনে আছে?

—না।

—কোন একটি কবিতার বিষয়বস্তুও মনে নেই?

—না।

—কোন কবিতা কি কখনও কোথাও ছাপা হয়েছিল?

—প্রেসিডেন্সি কলেজের ম্যাগাজিনে ও লিটল ম্যাগাজিনে কয়েকটি কবিতা ছাপা হয়েছিল।

—সে সব কবিতার বিষয়ে কিছু মনে পড়ে কি ?

—না।

—সে সব কবিতার দু'চারটে লাইন কি মনে আছে ?

—না।

এবার ব্যারিস্টার সাহেব হাকিমের দিকে তাকিয়ে বললেন, ইওর অনার, জয়ন্তভূষণের মত আমিও প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েছি এবং কবিতা নিয়মিত পড়ি। তাই জয়ন্তভূষণের কবিতাও আমি পড়েছি। আপনার অনুমতি নিয়ে আমি একটি কবিতার কয়েকটি লাইন পড়ছি।

ঠিক এই সময় হেমন্ত উকিল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ইওর অনার, কবিতা পড়ে কোর্টের সময় নষ্ট করার কোন অধিকার মাননীয় বন্ধুর আছে কি ?

—ইওর অনার, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, বিনা কারণে আমি কোর্টের এক মিনিট সময় নষ্ট করব না।

হাকিম শীলা চৌধুরী বললেন, হ্যাঁ, আমার সে বিশ্বাস আছে।

—ইওর অনার, 'নতুন প্রভাত' লিটল ম্যাগাজিনে জয়ন্তভূষণের যে কবিতাটি বেরিয়েছিল, তার নাম 'চন্দনা'। আমি সেই 'চন্দনা' কবিতার কয়েকটি লাইন পড়ছি—

চন্দনা, তুমি আমার
আমার অতীত
আমার বর্তমান
আমার ভবিষ্যৎ
চন্দনা, তুমি আমার
জীবন, যৌবন, আদর্শ,
তুমি আমার রূপকার
শুধু আমার সুরকার।

—ইওর অনার, এবারের লাইন ক'টি একটু মন দিয়ে শুনবেন।

চন্দনা।

তোমার কালো হরিণ চোখ

আমার সূর্য, জীবন-সূর্য

তোমার রক্তিম ওষ্ঠে

আমার আমার নিত্য বসন্তের ইঙ্গিত,

তোমার বক্ষের হিমালয় শৃঙ্গে

আমার নিত্য দাহ-র চিরশান্তি।

কোর্ট-রুমে মৃদু হাসির গুঞ্জন হতেই হাকিম বললেন, অর্ডার! অর্ডার!

ব্যারিস্টার সাহেব সাক্ষীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, ইয়েস জয়ন্তভূষণ. এই চন্দনা কি কল্পনার? নাকি বাস্তবের?

—কল্পনার।

—নো। বাঘের মত গর্জে উঠলেন শঙ্করদাস। বললেন, চন্দনা সেনগুপ্তা আপনার বান্ধবী এবং তার সঙ্গে আপনার রহস্যজনক সম্পর্ক এখনও আছে।

—কখনই না।

—চন্দনা সেনগুপ্তা আপনার বান্ধবী না?

—না।

—তবে তিনি কি?

—শুধু পরিচয় আছে।

প্রফেসারের উত্তর শুনে কোর্টরুমের সবাই হোহো করে হেসে উঠলেন।

—চন্দনার সঙ্গে আপনার কোন রহস্যজনক সম্পর্ক আছে কি?

—না, কোন রহস্যজনক সম্পর্ক নেই।

—তবে কি ধরনের সম্পর্ক আছে?

—দুটি ছেলেমেয়ের মধ্যে দীর্ঘদিনের পরিচয় থাকলে যে ধরনের সম্পর্ক থাকে, তাই আছে।

—সে ধরন কি মা ও ছেলের মত?

আবার কোর্টরুমে হাসি।

জয়ন্তবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, সমবয়সীদের মধ্যে মা ও ছেলের সম্পর্ক হয় না।

—তবে কি ভাই-বোনের মত?

—না, ঠিক তাও নয়।

—তবে কি প্রেমিক-প্রেমিকার মত?

—না।

—তবে কি ধরনের?

—বন্ধুর সম্পর্ক বলতে পারেন।

ব্যারিস্টার শঙ্করদাস মুখার্জী হাকিমের দিকে তাকিয়ে বললেন, ইওর অনার, আপনার অনুমতি নিয়ে মাত্র আড়াই বছর আগে লেখা চন্দনার ছোট্ট একটা চিঠি পড়ছি।

হাকিম বললেন, হ্যাঁ, পড়ুন।

—চন্দনা লিখছে—জয়, বাড়িতে অনেক লোক। বড় চিঠি লেখার সময় বা সুযোগ নেই। শুধু জানাই, শেখর অফিসের একটা সেমিনার ও ট্রেনিং কোর্সে যোগ দেবার জন্য সামনের রবিবার তিন সপ্তাহের জন্য বোম্বে যাচ্ছে। সে সময় বুড়ো শ্বশুর ছাড়া এখানে আর কেউ থাকবে না। সুতরাং তুমি অবশ্যই সে সময় কলকাতায় আসবে। তোমাকে মাঝে মাঝে না পেলে যে আমি পাগল হয়ে যাই, তা কি জান না? আমার লক্ষ কোটি চুমু নাও। —তোমারই চন্দনা।

হাকিম সাক্ষীকে প্রশ্ন করলেন, এই চিঠি কি চন্দনা আপনাকে লিখেছিলেন?

—হ্যাঁ।

—কোর্ট-রুম স্তব্ধ!

আরও কত প্রশ্ন করলেন ব্যারিস্টার সাহেব। কিন্তু একটি বারের জন্যও মিস তপতী চক্রবর্তী সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করলেন না। হঠাৎ

দিনের শেষে উনি হাকিমকে আবেদন করলেন, ইওর অনার, আগামীকাল মিস তপতী চক্রবর্তীকে কোর্টে হাজির হবার আদেশ জারি হয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত খুশি হলাম।

সারা কোর্ট-রুমে যেন ভূমিকম্প হয়ে গেল।

পরের দিন কোর্টে ভিড় সামলাবার জন্য হাকিম পুলিশ তলব করলেন।

হেমন্ত উকিল মিস চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর বললেন, এবার বিরোধী পক্ষের মাননীয় বন্ধু ওঁকে জেরা করতে পারেন।

—ইওর অনার, আমি মিস চক্রবর্তীকে যখন জেরা করব, তখন কোর্টের মধ্যে বাইরের লোকজন না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

কোথাকার জল কোথায় গড়ায়, তার ঠিক নেই ভেবেই হেমন্ত উকিল সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে হাকিমকে বললেন, ইওর অনার, মিস চক্রবর্তীকে ইন্-ক্যামেরা জেরা করাতে আমার কোন আপত্তি নেই।

হাকিমের আদেশমত কোর্ট-রুম থেকে বাইরের লোকজনকে পুলিশ বের করে দিল। এই মামলার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত কয়েকজন ছাড়া আর কেউ ভিতরে থাকলেন না।

ব্যারিস্টার উঠে দাঁড়িয়ে সাক্ষী মিস তপতী চক্রবর্তীকে বললেন, মহামান্য হাকিমের আদালতে সবিতার ভাগ্য নির্ধারিত হতে চলেছে এবং মাননীয় হাকিম যাতে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন, সেজন্য আমি আপনার সাহায্য ভিক্ষা করছি।

মিস চক্রবর্তী গম্ভীর হয়ে বললেন, আমার যথাসাধ্য নিশ্চয়ই করব।

—অশেষ ধন্যবাদ। ব্যারিস্টার সাহেব অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে সাক্ষীকে বললেন, আমি আপনাকে মাত্র দু'তিনটি প্রশ্ন করতে চাই। আশা করি আপনি সঠিক উত্তর দেবেন?

—হ্যাঁ, দেব।

—অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন, সঠিক উত্তর না পেলে আমাকে অযথা অনেকক্ষণ ধরে আপনাকে জেরা করতে হবে।

—আপনি সঠিক উত্তরই পাবেন।

সাক্ষীর কাঠগোড়ার রেলিঙের ওপর হাত রেখে ব্যারিস্টার সাহেব অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি জয়ন্তভূষণ রায়কে ভালবাসেন?

—হ্যাঁ।

—খুব ভাল। এবার বলুন, জয়ন্তভূষণ রায় কি আপনাকে ভালবাসেন?

—হ্যাঁ।

—ভেরি গুড! এবার বলুন, শান্তিনিকেতনের বসন্তোৎসব দেখে ফেরার পথে আপনারা দুজনে কি এক সঙ্গে কোথাও রাত কাটিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ।

—একই ঘরে, একই বিছানায়?

—না।

—এবার সোজাসুজি প্রশ্ন করি, আপনাদের দু'জনের মধ্যে কি দৈহিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে?

এবার মিস চক্রবর্তী হাকিমের দিকে তাকিয়ে বললেন, ইওর অনার, এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া কি জরুরী?

হাকিম ব্যারিস্টার সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, সাক্ষী আপনার এই প্রশ্নের জবাব না দিলে আপনার খুব বেশি আপত্তি আছে?

ব্যারিস্টার সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আমার শেষ প্রশ্নের উত্তর দিতে সাক্ষীর যখন দ্বিধা হচ্ছে, তখন আর আমি জোর করব না।

হাকিম, হেমন্ত উকিল ও সাক্ষী তিন জনেই ওঁকে ধন্যবাদ জানালেন।

মিস চক্রবর্তী, এবার আমি শেষ প্রশ্ন করব।

—করুন।

—জয়ন্তবাবু কোন উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করে আপনাকে বিয়ে

করার জন্যই কি মিসেস রায়কে দু'বছরের জন্য এখান থেকে কলকাতায় সরিয়ে দেন ?

—হ্যাঁ।

ব্যারিস্টার সাহেব সঙ্গে সঙ্গে হাকিমের দিকে মাথা নত করে নিবেদন করলেন, ইওর অনার, আমার কাজ শেষ। আমার কাজে সহায়তা করার জন্য আপনাকে এবং এই মামলার সঙ্গে জড়িত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি।

ব্যারিস্টার শঙ্করদাস মুখার্জি কোর্ট থেকে বেরিয়েই মোটরে চড়ে কলকাতা রওনা হলেন।

এক সপ্তাহ পরে হাকিম শীলা চৌধুরী রায় দিলেন—সভ্য মানব-সমাজের মূল ভিত্তি হচ্ছে বিবাহব্যবস্থা। বিবাহ থেকেই সন্তান ও সংসার, তারপর সমাজ ও দেশ। বিবাহব্যবস্থা না থাকলে সভ্য সমাজ গড়ে উঠত না। তাই শুধু দুটি নারী-পুরুষের কামনা-বাসনা-লালসা চরিতার্থ করার জন্য বিবাহ চালু হয় নি এবং তাই তো বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে বহু চিন্তা-ভাবনার পর নানা দেশে আইন তৈরি করা হয়েছে। দীর্ঘ আলোচনার পর আমাদের দেশেও বিবাহ বিচ্ছেদের আইন হয়েছে।

স্তব্ধ কোর্ট-রুম। এত ভিড় তবু কারুর মুখে একটি শব্দ নেই।

হাকিম বলে যান—সাংসারিক জীবন যাতে দুর্বিষহ না হয়ে ওঠে, সেজন্য স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই মিলিতভাবে বা এককভাবে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রার্থনা করতে পারেন।

আরোও অনেক কিছু বলার পর হাকিম শীলা চৌধুরী বললেন, আলোচ্য মামলায় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে, আবেদনকারীর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর সম্পর্ক কখনই তিক্ত হয় নি; বরং সাক্ষ্য-প্রমাণাদির দ্বারা এই কথাই স্পষ্টভাবে বোঝা গেছে, তাঁরা যতদিন একত্রে বসবাস করেছেন তাঁদের সম্পর্ক মধুর ছিল।

এই মামলায় একথাও প্রমাণ হয়েছে যে সবিতার সরলতা ও

ভালবাসার সুযোগ নিয়ে আবেদনকারী গোপনে কুমারী তপতী চক্রবর্তীর সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে তোলেন। শুধু তাই নয়, আবেদনকারী বিবাহিত জীবনে স্ত্রীকে লুকিয়ে চন্দনা সেনগুপ্তার সঙ্গেও দৈহিক সম্পর্ক বজায় রাখেন। সব চাইতে বড় কথা, দু' বছর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন রকমের সম্পর্ক না থাকলে অবশ্যই বিবাহ বিচ্ছেদ হতে পারে এবং আলোচ্য ক্ষেত্রে আবেদনকারী ও স্ত্রীর মধ্যে সত্যি সত্যি কোন রকম সম্পর্ক ছিল না।

হাকিমের কথা শুনে হেমন্ত উকিলের মনে আশা জাগে আপাত-দৃষ্টিতে এই বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন মঞ্জুর, অর্থাৎ করা উচিত।

হেমন্ত উকিল ও জয়ন্তবাবু মনে মনে উল্লসিত হয়ে ওঠেন।

কিন্তু একথাও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে, একটি দুর্ভাগ্যজনক চক্রান্তের জন্যই এই দু'বছর জয়ন্তবাবু সবিতার সঙ্গে কোন সম্পর্ক বা যোগাযোগ রাখেন না। একজন নির্দোষ নারীকে এইভাবে বঞ্চিতা করার জন্য উচ্চ শিক্ষিত অধ্যাপকের চক্রান্ত সত্যি অত্যন্ত দুঃখজনক।

হেমন্ত উকিল ও জয়ন্তবাবুর মুখ শুকিয়ে যায় হাকিমের কথা শুনে।

সবশেষে হাকিম শীলা চৌধুরী বললেন, সব কিছু অত্যন্ত গভীরভাবে বিবেচনা করে আমি এই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে আবেদনকারী বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন মঞ্জুর করা উচিত নয়।

হাকিম উঠে দাঁড়াতেই লোকজন বিচ্ছিরি উত্তেজনায় চিৎকার করতেই সবিতা পাগলের মত হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, চুপ করুন।

আশ্চর্য! মুহূর্তের জন্য সবাই যেন বোবা হয়ে গেলেন। তারপর সবিতা কোর্ট-রুমের এদিক থেকে ওদিক গিয়ে জয়ন্তবাবুর দুটি হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, চল, বাড়ি যাই।

জয়ন্তবাবু নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াতেই সবিতা ওঁর হাত ধরে কোর্ট-রুমের বাইরে বেরিয়ে এসে রিকশায় উঠলেন।

উপস্থিত জনতা মন্ত্রমুগ্ধের মত নীরবে সে দৃশ্য দেখে যার যার বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

সারা শহরের মানুষ হাকিম শ্রীমতী শীলা চৌধুরীর প্রশংসায় মেতে উঠল।

সারা শহরের মানুষ সেদিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেও কোর্ট থেকে বাংলোয় ফিরেই শীলা চৌধুরী কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠলেন। এক বিচিত্র অস্বস্তি নিয়ে কাটালেন সন্ধ্যে, রাত্তির। বিছানায় শুয়েও দুটি চোখের পাতা এক করতে পারলেন না। কি এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় মন ছটফট করে উঠল।

তারপর শীলা চৌধুরীর মনে পড়ল কত কথা কত কাহিনী।

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তখন কত বিখ্যাত অধ্যাপক কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সবার চাইতে প্রিয় ছিলেন অধ্যাপক শিবনাথ বাঁড়ুজ্যে। যেমন ছিল পাণ্ডিত্য, তেমনি ছিল মনের ঔদার্য। এমন অসাধারণ আদর্শবান অধ্যাপক যেন ছাত্র-ছাত্রীরা কখনও দেখেনি।

শাঁখারী পাড়ার মুখেই একটা দোতলা বাড়িতে শিবনাথবাবু থাকেন স্ত্রী আর চার ছেলেমেয়ে নিয়ে। সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত সে বাড়িতে ছাত্রছাত্রীদের আসা যাওয়ার শেষ ছিল না। বাইরের লোকজন বুঝতেই পারতেন না, কারা ছাত্রছাত্রী আর কারা ওঁর ছেলেমেয়ে। সত্যি কথা বলতে কি, শিবনাথ বাঁড়ুজ্যে সব ছাত্র-ছাত্রীকেই নিজের সন্তান মনে করতেন।

শিবনাথবাবুর দুই ছেলে দুই মেয়ে। চারজনেই লেখাপড়ায় ভাল, বাপের মত আদর্শবান।

দেখতে দেখতে দিন এগিয়ে চলে। অজয় এম এস-সি পাস করে বেঙ্গল কেমিক্যালে ঢোকে। ছোট ছেলে সুজয় শিবপুর বি. ই. কলেজে ভর্তি হয়। বি. এ. পাস করার পর পরই বড় মেয়ে লীনার হঠাৎ বিয়ে হয়ে চলে যায় পাটনায়। শীলা তখন ক্লাস সেভেন-এ পড়ে।

পূজার ছুটিতে সদর ঘাটে স্টিমার চড়ে শিবনাথবাবু স্ত্রী আর শীলাকে নিয়ে দেশের বাড়ি গেলেন কিন্তু ঢাকায় ফিরে এলেন শুধু মেয়েকে নিয়ে।

তিন ছেলেমেয়ে কাছে থাকে না। বিপত্নীক শিবনাথবাবু ছোট মেয়েকে নিয়ে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। না, শেষ পর্যন্ত কোন অসুবিধে হলো না। বিবাহিত ছাত্রছাত্রীরা এগিয়ে এল তাদের প্রিয় অধ্যাপকের সংসার সামলাতে।

ঠিক এমনি সময় দেশটা দু'টুকরো হলো। চোখের জল মুছতে মুছতে শিবনাথবাবু একদিন সন্ধ্যেবেলায় ছোট মেয়ের হাত ধরে এসে পৌঁছলেন শিয়ালদ স্টেশনে।

দু'চার দিন কষ্ট হলো ঠিকই কিন্তু কলকাতাতেও তো শিবনাথবাবুর কম ছাত্রছাত্রী ছিল না। তারা খবর পেতেই ছুটে এল বেলেঘাটার আস্তানায়। ওদের কাছে পেয়েই শিবনাথবাবুর মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল। বললেন, তোমাদের মত ছেলেমেয়ে যখন এসে গেছে তখন আর চিন্তা কি ?

সত্যি, চিন্তার কিছু রইল না। একজন ছাত্রীই তাদের একতলা ছেড়ে দিল ওদের। অজয় মেস ছেড়ে চলে এল পদ্মপুকুরের এই বাড়িতে। কয়েকজন ছাত্রছাত্রীই দৌড়ঝাঁপ করে শিবনাথবাবুর অধ্যাপনার কাজও যোগাড় করল।

শুরু হলো নতুন জীবন।

আস্তে আস্তে নতুন জীবনও পুরনো হয়। অজয়ের বিয়ে হয় শিবনাথবাবুরই এক ছাত্রীর সঙ্গে। সুজয় ইঞ্জিনিয়ার হয়ে মার্টিন বার্নে চাকরি পায়। শীলাও এম. এ. পাস করে।

তারপর ?

শিবনাথবাবু অবসর জীবনেও চুপ করে বসে থাকেন না। বই লেখেন, খাতা দেখেন। কখনও কখনও ছাত্রছাত্রীরা টেনে নিয়ে যায় তাদের কাছে। শীলা বাপের পদাঙ্ক অনুসরণ করে লেকচারার হয়।

শরতের মেঘের মত মানুষের জীবন কখন কোন্ দিকে ভেসে যাবে, তাকি কেউ বলতে পারে? শীলা হঠাৎ পাস করার খবর জানাতেই উনি বললেন, অন্যায় তো কিছু কর নি মা। এ চাকরিতে তুমি তো মানুষের অনেক উপকার করতে পারবে।

দুটো বছর কেটে গেল।

হঠাৎ একদিন বৃদ্ধ অধ্যাপক শিবনাথ বাঁড়ুজ্যে একটা চিঠি পেলেন।

বাবা, আমিও আপনার একটি মেয়ে। বছর তিনেক আগে আমার বিয়ে হয়েছে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী সতীনাথ চৌধুরীর সঙ্গে। বেশ সুখেই ছিলাম কিন্তু গত মাস ছয়েক ধরে আপনার মেয়ে শীলা আমার স্বামীর এমন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন যে, আমাদের সুখের সংসার এখন অতীত স্মৃতিমাত্র। মেয়ে হয়ে বাবাকে সব কথা লেখা যায় না, সম্ভব নয়, তাই সব কথা লিখছি না। শুধু একটি প্রশ্ন আপনার মত আদর্শবান অধ্যাপক ও মানুষের মেয়ে হয়ে কি আমাকে পথের ভিখারিণী করে সতীনাথকে বিয়ে করা শীলার উচিত হবে?

শিবনাথবাবু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন—মা চিত্রা, তোমার চিঠি পেলাম। আমি কল্পনাও করতে পারি না আমার মেয়ে এভাবে তোমার মত নিরপরাধ মেয়ের সর্বনাশ করবে। যাই হোক, শীলাকে চিঠি দিচ্ছি।

সেই দিন, সেই ডাকেই উনি শীলাকে চিঠি দিলেন। এক সপ্তাহের মধ্যেই জবাব এল—বাবা, আপনার কোন অভিযোগই অস্বীকার করব না। আপনার সঙ্গে বাদ প্রতিবাদের মধ্যে যাওয়াও আমার কল্পনাতীত। শুধু বলব সতীনাথকে আমি ভালবাসি, সে আমাকে ভালবাসে। সতীনাথ ডিভোর্স পেলেই আমরা বিয়ে করব। আপনার আশীর্বাদ কামনা করি।

না, এই চিঠির উত্তর দিতেও শিবনাথ বাঁড়ুজ্যে দেরি করলেন না—মা শীলা, তুমি যখন চরম সিদ্ধান্ত নিয়েই নিয়েছ তখন আর কিছু

বলব না। তবে তুমি জেনে রাখ শিবনাথ বাঁড়ুজ্যে শুধু ছুটি পুত্র ও ছুটি কন্যার পিতা না। তার সন্তান সংখ্যা কয়েক হাজার এবং তার মধ্যে তোমার মত একটি অপরাধিনীকে হারালে আমার কোন দুঃখ হবে না। নতুন শুভাকাঙ্ক্ষী ও ঈশ্বরের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা কর, আমার কাছে নয়।

চিঠির শেষে ইতি বাবা লিখলেন না, লিখলেন, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজ এই রাত্রে মহকুমা হাকিম শীলা চৌধুরীর সব মনে পড়ছে। মনে পড়ছে আরো একটা ঘটনা। সতীনাথকে বিয়ে করার বেশ কিছুদিন পরে শীলা অনেক সাহস সঞ্চয় করে গিয়েছেন পদ্ম-পুকুরের বাসায়। সেদিন ছিল রবিবার। বাইরের ঘরেই বৃদ্ধ শিবনাথবাবু কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। শীলা আর সতীনাথ ঘরে ঢুকে ওঁকে প্রণাম করতেই উনি মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন, কাকে চাই ?

আজ এই রাত্রির শেষ প্রহরে চোখের জল মুছতে মুছতে শীলা চৌধুরীর মনে হলো, বাবা পাস করে হাকিম হননি কিন্তু অমন বিচারপতি বোধ হয় বিক্রমাদিত্যের রাজত্বে ছিল না !

রাধা

অনেকেই আসে কিন্তু কেউ আর টেকে না। কেউ কেউ দু'চার দিন, কেউ বা দু'এক মাস। কেউ চুরি করে, কেউ কাজে ফাঁকি দেয় কারুর আবার পোষায় না। শেষ পর্যন্ত মিনতিকেই আবার সকাল সন্ধ্যেয় রান্নাঘরে ঢুকতে হয়। বাধ্য হয়ে ঢোকেন কিন্তু গজগজ করেন।

কালো স্ট্রেচলনের ট্রাউজারের সঙ্গে সাদা শার্টটা পরতে গিয়েই কমল বললেন, হ্যাঁগো, জামা কাচার পর একটু নীল দাও না কেন? দেখছ, জামাটা কেমন লালচে হয়েছে?

—তোমার গুণধর ভাই বা বোনকে বলো দোকান থেকে এক প্যাকেট নীল এনে দিতে।

কমল আর কিছু না বলে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ান কিন্তু মিনতি শুধু ঐটুকু বলেই চুপ করে থাকেন না। বিনুনি খুলতে খুলতে বলেন, সংসারের সব কাজ করে আমার আর দোকান যাবার সময় হয় না। বাবাইকে সাড়ে সাতটার মধ্যে খাইয়ে-দাইয়ে তৈরী করার পর তোমার অফিস যাবার ঠেলা সামলাতে সামলাতেই···

কমল গলায় বুকে পাউডারের পাফটা বুলাতে বুলাতেই বলেন, ঘোষ বৌদি যে একটা লোক দেবেন বলেছিলেন, তার কি হলো?

সেই ভোরবেলায় ঘুম থেকে ওঠার পর চুলে একবার চিরুনি দেবার সময় হয় নি মিনতির। এই ন'টার সময় বিনুনি খুলে আঙুল দিয়ে চুল ছাড়াতে ছাড়াতে বললেন, এইসব ন্যাকা ন্যাকা কথা বলো না তো! আমার মেজাজ গরম হয়ে যায়।

কমল ঘড়ি পরতে গিয়েই চমকে ওঠেন, ন'টা দশ! তাড়াতাড়ি পার্স হিপ পকেটে নিয়েই মিনতির হাত ধরে দরজার ও পাশে টেনে নেন। তারপর দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে অধরে একটা চুম্বন। মিনতি

চোখ ভরে একবার স্বামীকে দেখে নিয়েই বলেন, তাড়াতাড়ি ফিরো।

কমল হাসতে হাসতে বেরিয়ে যান কিন্তু দেরি হয়ে গেলেও গলির মোড়ে গিয়েই একবার মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পিছন দিকে তাকান। মিনতি জানলায় দাঁড়িয়েই হাত নাড়েন। কমল আর এক মুহূর্তও নষ্ট না করে হন হন করে চলে যান।

মিনতি জানলা থেকে সরতে গিয়েও সরতে পারেন না। সামনের উকিলবাবুর পুত্রবধূ রেখা ওর ঘরের জানলা থেকে মুখ টিপে হাসতে হাসতে ডাকেন, মিনতি ভাল আছিস ?

ওর মুখে চাপা হাসি দেখে মিনতিও হাসেন। বুঝতে পারেন হাসির কারণ। বলেন, তোর মত ভাল নেই।

—কমলদা বেরিয়ে গেছেন ? রেখা ন্যাকামি করে প্রশ্ন করেন।

—না ; আমার সঙ্গে গল্প করবে বলে···

হঠাৎ শাশুড়ী ঠাকরুণের উদাত্ত আহ্বান শুনেই রেখা বলেন, যাই ; মা ডাকছেন।

মিনতি ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে, একবার ভাল করে দেখেন। মনে মনে গুনগুন করেন, আমার রিক্ত ডালি দিব তোমারি পায়ে···

—বৌমা ! বিমল বাথরুম থেকে বেরিয়েছে।

শাশুড়ী ঠাকরুণের ঘোষণা শুনেই মিনতির গান থেমে যায়। অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বলেন, হ্যাঁ, যাই।

যাই বলেও যান না। মনে মনে ভাবেন, দু'মিনিট বসতে দেবেন না এঁরা। সবই ত রান্নাঘরে আছে। উনি কী নিজে ভাত বেড়ে ছেলেকে খেতেও দিতে পারেন না ?

না। ওনার বাত। নড়াচড়া করতে কষ্ট হয়।

মিনতি মনে মনে বলেন, বাতের আর কি দোষ ! বছরের পর বছর বসে থাকলে ··

—বৌমা ! বিমলকে খেতে দেবে না ?

বিমল খেতে খেতেই বলে, বৌদি, রাধায় এক সপ্ত. 'চারুলতা' এসেছে ; দেখবে ?

—কখন দেখব বলো ?

—কেন ? ম্যাটিনীতে।

—সিনেমা থেকে এসেই আবার রান্নাঘরে ঢুকতে ভাল লাগে না।

—তাই বলে কি সিনেমায় যাবে না ?

মিনতি একটু ভেবে বলেন, তুমি বরং শনিবার নাইট শো'র দু'টো টিকিট…

বিমল হাসতে হাসতে বলল, বাস ! দিলে আমার বারোটা বাজিয়ে। ভেবেছিলাম, তোমার ঘাড় ভেঙে…

বিমল ঠিক বেরুবে, এমন সময় মিনতি ওকে ঘরে ডেকে পনেরটা টাকা হাত দিয়ে বললেন, আমাদের দুটো টিকিট কাটবে ; আর তুমিও ম্যাটিনীতে দেখে নিও।

বিমল ফিসফিস করে বলল, ইউনিভার্সিটির কোন ছেলে একলা একলা ম্যাটিনীতে সিনেমা দেখে ?

মিনতি ওর হাতে আরো পাঁচটা টাকা দিয়ে হাসতে হাসতে বলেন, এত মাখামাখি কি ভাল হচ্ছে ?

বিমল চিলের মত ছোঁ মেরে টাকাটা নিয়েই বলল, তাড়াতাড়ি দাও। ও বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেই রেগে যাবে।

ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেও মিনতি ঐখানেই দাঁড়িয়ে থাকেন। নড়তে পারেন না। একটা আবছা খুশির আভা ফুটে ওঠে ওর চোখে মুখে। হঠাৎ এক মুহূর্তের জন্য মনে পড়ে নির্মাল্যর কথা। টুকরো টুকরো সুখস্মৃতি। প্রথম যৌবনের নিছক ভাললাগা। কদাচিৎ কখনও মনে পড়ে। তবু ভাল লাগে।

—বৌমা, ধোপা এসেছে।

ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নভঙ্গ। শুধু তাই নয়, বিরক্তিতে মন ভরে যায় মিনতির।

ধোপাকে বিদায় করে মিনতি ঘরে ঢুকতেই শাশুড়ী ঠাকরুণ জিজ্ঞেস করলেন, বৌমা, পোস্ত আছে?

—আছে।

—ঝিঙে আছে?

—আছে।

—একটু ঝিঙে পোস্ত করো তো। অনেক দিন পোস্ত খাই না।

—হ্যাঁ, করব।

এ সংসারে চিরকাল সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া হয়। কমলের বাবা বেঁচে থাকার সময় থেকেই এই নিয়ম চলছে। উনি ভোজন-রসিক ছিলেন বলে অফিস যাবার আগেই পঞ্চব্যঞ্জনে খেয়ে-দেয়ে যেতেন। এ সংসারে এখনও সেই নিয়ম চলছে বলে মিনতিকেও সাত সকালে সব রান্নাবান্না শেষ করতে হয়। পরে শুধু দুটো ভাত ফুটিয়ে নেওয়া হয়।

আজও সব রান্নাবান্না শেষ। কমল ডাল, ভাজা, আলু কপির তরকারী, পার্শে মাছের ঝোল আর টমাটোর চাটনি খেয়ে গেছেন। বিমলও তাই খেয়ে বেরুল। সুলেখাও এই সব খেয়ে কলেজ যাবে।

মিনতি ভেবেছিলেন, এখন দুটো একটা চিঠি লিখতে বসবেন। পাটনা থেকে দাদুর দু'তিনটে চিঠি এসেছে কিন্তু একটারও উত্তর দেওয়া হয় নি। ওদিকে ভিলাই থেকে আরতি ছ'পাতার চিঠি লিখেছে আজ কতদিন হয়ে গেল। তারও উত্তর দেওয়া হয় নি। অথচ এই আরতি যেদিন স্কুল-কলেজ যায় নি, সেদিন উনিও যেতেন না। আরো কয়েকজনকে চিঠি লেখার দরকার কিন্তু কিছুতেই সময় করে উঠতে পারেন না। আজও হবে না।

মিনতি পোস্ত বাটতে বসলেন।

দেওয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে এগারটা বাজলো। মিনতি ভাবে এই দিনটা ফুরোতে এখনও কত দেরি।

সত্যি, সারাদিনে সংসারের সবকিছু ঠেলা সামলাতে মিনতি যেন আর পেরে ওঠেন না কিন্তু না করেও উপায় নেই।

সংসারে কাজ করার লোক যে পাওয়া যায় না, তা নয়। কিন্তু কেউ চোর, কেউ ফাঁকিবাজ। কারুর আবার দু'তিন মাস কাজ করার পর মনে হয়, না, এ সংসারে তার পোষাবে না।

সত্যি, এক একটা অবতার। দুর্গার মত বয়স্কা মেয়েলোক পর্যন্ত মাছ চুরি করে খেতো। কী আশ্চর্য! আরে, তোকে কি মাছ দেওয়া হতো না? বেড়ালে মাছ খেয়ে গেছে বলে যে লোকটার রোজগারে সংসার চলছে, তারই মাছ খেয়ে নিলি?

যে মেয়ে রান্নাঘরে বসেই লুকিয়ে লুকিয়ে খায়, তাকে কি রাখা যায়? তাছাড়া কতদিন ধরে এমন চুরি করে খাচ্ছে, তার কি ঠিক আছে।

এই একটা দোষ ছাড়া দুর্গার আর কোন ত্রুটি ছিল না। ঠিকে ঝি বাসন মাজা আর ঘরদোর পরিষ্কার করত ঠিকই কিন্তু বাকী সব কাজ একাই সামলে নিত। মিনতির এখনও মনে হয়, দুর্গাকে ছাড়িয়ে দেওয়া ঠিক হয় নি। আবার সঙ্গে সঙ্গে ভাবেন, যে দু'তিনবার ধরা পড়ার পরও আবার চুরি করে খায়, তাকে বাড়িতে রাখাও যায় না।

আর ঐ সরযূ? ওর কথা মনে পড়লেই মিনতির গা জ্বলে যায়। যাবে না? ঠিক দু'দিন কাজ করেই ওর বিয়ের ঘড়িটা নিয়ে পালাল। সত্যি, কত সখের ঘড়ি। ছোট মামা সুইজারল্যাণ্ডে থাকেন বলেই অত দেখে-শুনে ঘড়িটা পছন্দ করেছিলেন। ও নাকি কয়েক বছর আগে সত্যবাবুর বাড়িতে কাজ করার পর ওর মেয়ের নতুন বেনারসী নিয়ে পালায়।

চপলা কি বদমাইস ছিল? বাপরে বাপ!

সত্যি, মেয়েটার কত গুণ ছিল। যেমন কথাবার্তা, তেমন কাজ-

কর্ম। দু'তিনদিন কাজ করার পরই মনে হতো ও যেন কত বছর ধরে এ বাড়িতে কাজ করছে। চপলাকে দেখতে তেমন ভাল ছিল না কিন্তু শরীরের গঠনই এমন ছিল যে সব পুরুষেরই ওকে দেখে ভাল লাগত।

যাই হোক ও যে রোজ রাত্তিরে ছাদে উঠে নন্দবাবুর চাকরটার সঙ্গে···

এইসব দেখে-শুনে লোকজন রাখতেও ভয় হয় কিন্তু না রেখেই বা উপায় কি? অথচ এই ক'মাস ধরে কতজনকে বলেও কাউকে পাওয়া গেল না। মিনতি যেন আর পারেন না। শাশুড়ী ঠাকরুণ সংসারের কোন কাজ করেন না ঠিকই কিন্তু নাতির সবকিছু করেন। অন্য সব কাজেই ওঁর বাতের ব্যথা বেড়ে যায়। ওঁর ধারণা ওঁর স্বর্গত স্বামীই বাবাই-এর রূপ নিয়ে আবার ফিরে এসেছেন। সত্যি উনি বাবাইকে খুব ভালবাসেন; ঠাকুমাকে ছাড়া নাতিরও এক মিনিট চলে না। সুলেখা যদি সংসারের টুকটাক কাজকর্ম করত তাহলেও মিনতির কত সাহায্য হতো কিন্তু সে নিজের পড়াশুনা আর গান নিয়েই ব্যস্ত। যেটুকু সময় পায়, তা সামনের উকিলবাবুর বাড়িতেই কাটাবে। উকিলবাবুর ছোট ছেলে জয়ন্তর সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্পগুজব না করলে ওর ঘুম আসবে না।

তাই তো বিছানায় শুয়েই মিনতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপন মনে বললেন, যাক, আজকের মত ছুটি।

কমল পাশ ফিরে শুয়ে ওর গায়ের উপর হাত রেখেই বললেন, সত্যি, তোমার খুব পরিশ্রম যাচ্ছে। গিরিনদা ত বলছিলেন···

—উনি ত মাস খানেক ধরেই বলছেন, একটা ভাল লোক দেবেন···

—গিরিনদা বাজে কথা বলার লোক না।

—তা বলছি না; তবে ভাল লোক দেবেন বললেই ত দেওয়া সহজ না।

—তা ঠিক ; তবু উনি আজেবাজে কাউকে দেবেন না।

মিনতি আর কথা বলেন না।

কমল এবার ওকে একটু নিবিড় করে কাছে টানতেই উনি একটু হেসে বলেন, গিরিনদার লোক যতদিন না আসবে, ততদিন তুমি আমাকে একটুও বিরক্ত করবে না। তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বলেন, রাত্রে ভাল ঘুম না হলে পরের দিন আর কাজকর্ম করতে পারি না।

—না, না, আজ তোমাকে বিরক্ত করব না। তুমি ঘুমোও।

—থাক। আর ন্যাকামি করতে হবে না। তুমি যে কেমন সাধু, তা আর আমি জানি না?

মজার কথা পরের দিন সকালেই গিরিনবাবু নিজেই একটি মেয়েকে হাজির করে বললেন, রাধা বছর খানেক আমার শালার ওখানে কাজ করছিল কিন্তু কোম্পানী থেকে ওকে দু'বছরের জন্য বিলেত পাঠাচ্ছে বলে···

কমল হাসতে হাসতে বললেন, কাল রাত্তিরেই আমি মিনতিকে বলছিলাম গিরিনদা ঠিক···

শুনে উনি খুশির হাসি হাসেন।

মিনতি বলেন, হ্যাঁ দাদা, কাল রাত্তিরেই কথা হচ্ছিল। এবার উনি মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন, সব রান্নাবান্না জানো ত?

—হ্যাঁ।

—চল, তোমাকে মার কাছে নিয়ে যাই।

শাশুড়ী ঠাকরুণের কাছে ইন্টারভিউ শেষ হবার পর মিনতি ড্রইংরুমে এসে ঘোষণা করলেন, মেয়েটিকে মারও ভাল লেগেছে।

গিরিনবাবু বললেন, রাধা সত্যি ভাল মেয়ে। দু'দিনের মধ্যেই ও এমন হয়ে যাবে যে মনেই হবে না বাইরের লোক।

মিনতি বললেন, সেই রকম মেয়ে না হলে কি সংসারের ভার ছেড়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়?

গিরিনবাবু একটুও বাড়িয়ে বলেন নি। সত্যি রাধা কয়েক দিনের

মধ্যেই শুধু সংসারের সব দায়িত্বই নিল না, বাড়ির সবার কাছে অত্যন্ত প্রিয় হয়েও উঠল।

বিমল তখনও বোধহয় জেগে ছিল কিন্তু শাশুড়ী ঠাকরুণ তার নাতিকে নিয়ে অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। রাত্রের খাওয়া-দাওয়ার পর মিনতি কোনদিন রেখার সঙ্গে গল্প করেন; কোনদিন আবার সুলেখার সঙ্গে আড্ডা দেন। এগারটার আগে কোনদিনই মিনতি নিজের ঘরে ঢোকেন না।

সেদিন সুলেখা জয়ন্তর লেখা কয়েকটা চিঠি পড়তে দিয়েছিল বলে আড্ডাটা একটু বেশি রসোত্তীর্ণ হয়। মিনতি যখন ঘরে ঢুকলেন তখন সাড়ে এগারটা বেজে গেছে। খাটের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে বুকের তলায় বালিশ দিয়ে কমলকে বই পড়তে দেখেই উনি বললেন, তুমি এখনও পড়ছ?

বই থেকে মুখ না তুলেই কমল জিজ্ঞেস করলেন, ক'টা বাজে?

—প্রায় পৌনে বারোটা।

—সেকি?

কমল সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসেন। বইখানা পাশের টি'পয়তে রেখেই বলেন, নাও, লাইট অফ করো।

শুলেই কি ঘুম পায়? বরং সারাদিন পর দু'জনে কাছাকাছি এলেই ঘুম পালিয়ে যায়? তখন কত কথা। সারাদিনের অব্যক্ত কথা বলাবলি করেন দু'জনে। মিনতির মুখে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কমল বলেন, দিন দিনই তুমি আরো সুন্দর হয়ে উঠছ।

—মোটেও সুন্দর হচ্ছি না; তবে রাধা সবকিছু সামলায় বলে···

—তা ঠিক।

মিনতি একটু হেসে বলেন, তোমাকে রাধা খুব ভক্তি করে।

কমল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, কেন?

—রাধা বলে, জামাইবাবুর মত মানুষ হয় না।

—কেন?

—বলে, জামাইবাবুর কোন ঝামেলা নেই। তাছাড়া সব সম হাসি খুশি।

কমল হাসেন।

মিনতি আবার বলেন, রাধা বাবাইকেও খুব ভালবাসে।

—হ্যাঁ, বাবাই বলছিল, মাসীর সঙ্গে পার্কে গিয়েছিল।

—রাধা ত আজকাল রোজই বাবাইকে নিয়ে বিকেলে বেড়াতে যায়।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ; ও বলে, বাচ্চারা বিকেলে একটু খোলামেলা জায়গায় দৌড়দৌড়ি না করলে কি শরীর ভাল হয়?

—ঠিকই বলে। কমল একটু থেমে বলেন, ও যে রোজ বাবাইকে নিয়ে বেড়াতে যায়, তারজন্য সংসারের কাজকর্মের কোন ক্ষতি হয় না?

—না, না; ও ত বেরুবার আগেই রান্নাবান্না শেষ করে নেয়। সন্ধ্যের পর শুধু ভাত রুটি করে।

—মেয়েটা বেশ কাজের আছে, তাই না?

—শুধু কাজের কেন? যেমন ভদ্র সভ্য তেমনই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

কমল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, যাক, এতদিনে তাহলে তুমি একটা পছন্দ মত লোক পেয়েছ।

—তা পেয়েছি।

কমল এবার মিনতিকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলেন, তাহলে এখন তোমাকে নিয়মিত বিরক্ত করতে পারি, কি বলো?

—বিরক্ত কী করছ না? আমাকে কি তুমি ছেড়ে দাও?

রাধার দিন শুরু হয় সেই ভোরবেলায়। পাঁচটার আগেই। বাথরুমে গিয়ে বাসি কাপড়-চোপড় ধুয়ে কাচা কাপড় পরে রান্নাঘরে গিয়েই একটা ওভেনে চায়ের জল আর অন্যটায় ডাল বসিয়ে দেয়। চায়ের জল হতে না হতেই বাবাই-এর স্কুল ড্রেস ইস্ত্রি করবে।

আগে মিনতিও এর মধ্যে উঠে পড়তেন কিন্তু এখন অত সকাল সকাল ওঠার দরকার হয় না। এখন এত ভোরে শুধু কমলের মা ওঠেন। উনি বাথরুম থেকে বেরুতেই রাধা ওকে চা দিয়ে বলে, মাসীমা চা।

এই সময় ওরা দুজনেই শুধু চা খান কিন্তু রাধা ফ্ল্যাক্স ভর্তি লিকার রেখে দেয়। যে যখন ঘুম থেকে ওঠেন, তাকেই এক মিনিটের মধ্যে ঐ লিকারের মধ্যে এক হাতা ফোটান দুধ মিশিয়ে চা দেয়—জামাই-বাবু, চা রইল। মিনতির দিকে তাকিয়ে বলে, দিদি, আপনার চা ডাইনিং টেবিলে।

প্রেসার কুকারে ডাল সিদ্ধ হতেই ফ্রিজ থেকে বের করে আনা মাছ ভাজতে শুরু করে। ওদিকে ঠাকুমার কোলে চড়ে বাবাই বাথ-রুম থেকে বেরুলেই রাধা ওকে নিজের কোলে নিয়ে একটু আদর করবেই। ঐ আদর করতে করতেই ওর মুখের কাছে দুধের গেলাস ধরে বলবে, সোনা বাবা, আজ টিফিনে কি খাবে?

—লুচি!

—কি দিয়ে লুচি খাবে আমার সোনা বাবা?

—সন্দেশ!

—আর কিছু না?

—না!

—ক'টা লুচি খাবে বাবা?

—দুটো সন্দেশ আর একটা লুচি খাব!

রাধা হেসে বলে, একটা লুচি খেলেই আমার সোনা বাবার পেট ভরবে?

—খুব বড় একটা লুচি খাব।

বাবাই স্কুলে রওনা না হওয়া পর্যন্ত রাধা রান্নাবান্না করতে থাকলেও অন্য কারুর দিকে আর বিশেষ নজর দেয় না। বাবাই বেরিয়ে যাবার

তার পরই রাধা আধ মগ গরম জল ড্রেসিং টেবিলের উপর রেখে বলে, জামাইবাবু, দাড়ি কামাবার জল রইল।

দাড়ি কামান শেষ হবার পর কমল তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে না মুছতেই রাধা ঝড়ের বেগে ঘরে এসে আরেক কাপ চা দিয়েই বলে, চা খেয়েই বাথরুম যাবেন জামাইবাবু।

বাড়ির আর সবাই ড্রইংরুমে বসে চা খেতে খেতে টুকটাক গল্প-গুজব করেন। খবরের কাগজের পাতা উল্টিয়েই সুলেখা বলে, বৌদি, রবিবার রবীন্দ্রসদনে খুব ভাল গানের ফাংশান আছে, যাবে শুনতে ?

—না, ভাবছি শনিবার দিদির কাছে যাব। তোমরা দু'ভাইবোনে যাও।

কথাটা শুনে বিমল হাসল। সুলেখা ঠোঁট উল্টে বলল, ছোড়দা আমাকে নিয়ে গেলেই হয়েছে।

রাধা রান্নাবান্না করতে করতেই ঠিকে ঝি'র মাজা বাসন-কোসন ধুয়ে তুলে রাখে। এক ফাঁকে ডাইনিং টেবিল মুছে দিয়েই এক গেলাস জল ঢেকে রাখে। দেয়াল ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়েই একবার মুহূর্তের জন্য ড্রইংরুমে এসে মিনতিকে বলে, জামাইবাবুর বাথরুম থেকে বেরুবার সময় হয়ে গেছে।

মিনতি সে কথা শুনেই কমলের জামাকাপড় বের করতে চলে যান।

ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাধা কাজ করে। ঠিক পৌনে ন'টায় কমল খেতে বসেন। মাছের ঝোল খেতে গিয়েই বলেন, ক'টা মাছ খাব ?

রাধা একটু দূরে দাঁড়িয়ে বলে, অফিসে দুপুরবেলায় আজেবাজে জিনিস খাবার চাইতে বাড়ি থেকে পেট ভরে খেয়ে যাওয়া অনেক ভাল।

—আবার দুটো ঝোলের মাছ খাব ?

—দিয়েছি যখন খেয়ে নিন। রাধা একটু থেমে বলে, এ মাছ ত আজ শেষ করতেই হবে। কাল ত আবার বাজার হবে।

পাশের চেয়ারেই বসে আছেন মিনতি। তার দিকে তাকিয়ে কমল একটু হেসে বলেন, রাধা যেভাবে খাওয়াচ্ছে তাতে ছ'মাস পরে তোমরা আর আমাকে চিনতে পারবে না।

—কেন ?

—কেন আবার ? এমন মোটা হবো যে···

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই রাধা একটু হেসে বলে, এমন কি খেতে দিই যে আপনি মোটা হয়ে যাবেন ?

কমল হেসে বলেন, অফিস যাবার সময় মিনতি বেশী খেতে দিলেই রাগারাগি করতাম কিন্তু তোমার সঙ্গে যে ঝগড়া করতে পারি না।

—বলুন দিদি, আমি কি কিছু অন্যায় করছি যে জামাইবাবু আমার সঙ্গে ঝগড়া করবেন ?

মিনতি হেসে বলেন, তোমার জামাইবাবু যা ইচ্ছে বলুক ; তুমি তোমার মত খেতে দিও।

কমলের মা ওদিকের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ছেলেকে বলেন, রাধা সেই সাত সকালে উঠে তোদের জন্য কত কি রান্না করে ; আর তোরা খেতে পারবি না ?

কমলের খাওয়া শেষ হতেই রাধা এক গেলাস খাবার জল ঘরের টি-পয়'র উপর রেখে আসে। উনি ঘর থেকে বেরুবার আগেই ও জুতা পরিষ্কার করে দেয়।

কমল ঘর থেকে বেরুবার আগে জল খেয়ে গেলাসটা মিনতির হাতে দিয়ে বলেন, রাধার সব দিকে নজর আছে।

—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া কিছু বলে দিতে হয় না।

একটু পরেই কমল বেরিয়ে পড়েন। গলির মুখে গিয়েই যথারীতি একবার থমকে দাঁড়ান। পিছন ফিরে তাকিয়ে মিনতিকে জানলায় দেখেন। দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিতে গিয়েই সিঁড়ির জানলার এক পাশে রাধাকেও দেখেন। ভাবেন, হয়ত ছাদে যাচ্ছে কোন কাজে।

কিছুক্ষণের মধ্যে বিমল ও সুলেখাও বেরিয়ে যায়। ওরা বেরুবার পর রাধা কাজকর্মে একটু ঢিলে দেয়। হয়ত একটু ঘুরে বেড়াবে এদিক ওদিক। অথবা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপন মনে কি যেন ভাবে, কি যেন দেখে। তারপর ড্রইংরুমে এসে শাশুড়ী পুত্রবধূর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, মাসীমা, চা খাবেন ? দিদি, আপনি ?

—না, আমি খাব না।

মিনতি বুঝতে পারেন, ভোরবেলা থেকে কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এখন ও একটু আয়েশ করে চা-টা খেতে চায়। তাই উনি বলেন, তুমি আমার আর তোমার চা কর।

রাধা রান্নাঘরের দিকে পা বাড়িয়েও দেয়ালে কমলের কোলে বাবাই-এর ছবিটা দেখে একটু দাঁড়ায়। বলে, দিদি, মনে আছে ত এই ছবির একটা কপি আমার চাই ?

মিনতি হেসে বলেন, হ্যাঁ মনে আছে।

আবার সংসারের চাকা ঘুরতে শুরু করে। এদিকে ঠিকে ঝি এসে কাপড়-চোপড় কেচে দিয়ে চলে যায়। রান্নাঘরের সব কাজ শেষ করেই রাধা মিনতির ঘরে এসে বলে, দিদি, জামাইবাবুর জামা-কাপড় দিন।

—তোমার রান্নাঘরের কাজ শেষ ?

—হ্যাঁ।

—আজ শুধু এই একটা শার্ট আর গেঞ্জি আণ্ডার ওয়ার কেচে দিলেই হবে।

—আর কিছু নেই ?

—থাক ; আজকে আর কাচতে হবে না।

—থাকবে কেন ? যা আছে দিয়ে দিন।

মিনতি আলমারির ভিতর থেকে আরো দুটো শার্ট বের করে দেন।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর রাধা ঘন্টাখানেক না ঘুমিয়ে পারে না

কিন্তু বাবাইএর স্কুল বাসের হর্ন শুনেই ওর ঘুম ভেঙে যায়। মাথার খোঁপা বা কাপড়ের আঁচল কোনমতে সামলে নিয়েই দৌড়ে গিয়ে বাবাইকে কোলে নিয়ে বাড়ি আসে।

বাবাই খায় ঠাকুমার কোলে বসে কিন্তু মিনতি আর রাধা পাশেই বসে থাকে। খেতে খেতেই বাবাই ঘুমে ঢুলে পড়ে।

বাবাই ঘুমিয়ে পড়লেই রাধা রাত্তিরের রান্নাবান্না ও বিকেলের জলখাবার তৈরী শুরু করে দেয়। এ সব শেষ করেই গা ধুয়ে কাপড়-চোপড় বদলে ও বাবাইকে নিয়ে বেড়াতে যায়।

—বেড়াতে ভাল লাগে না বাবাই সোনা?

—হ্যাঁ। বাবাই একটু চুপ করে থাকার পর হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, মাসী, তুমি বাঘ দেখেছ?

—না বাবা, আমি বাঘ দেখি নি?

—সিংহ?

—না।

—জলহস্তী?

—না বাবা, ওসব দেখি নি।

—আচ্ছা মাসী, উটপাখী দেখেছ?

—না, তাও দেখি নি।

—তুমি কিছুই দেখ নি?

—কোথায় দেখব বাবা?

—কেন? চিড়িয়াখানায়।

রাধা ওর মাথায় হাত দিতে দিতে বলে, আমাকে ত কেউ চিড়িয়াখানায় নিয়ে যায় নি। তুমি নিয়ে যাবে?

—আমি কি বড় হয়েছি যে তোমাকে নিয়ে যাব?

—তুমি বড় হলে আমাকে চিড়িয়াখানা নিয়ে যেও।

—সে ত অনেক দেরি।

—তা হোক।

মিনতি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, চিড়িয়াখানায় গিয়ে বাঘ—ভাল্লুক দেখার সখ আমার নেই।

কমল বললেন, দু'এক সপ্তাহের মধ্যেই একদিন ওদের ঘুরিয়ে আনব।

চিড়িয়াখানা? সে কেমন জায়গা? সেখানে বাঘ ভাল্লুক সিংহ হাতি থাকে কেমন করে। ওরা কামড়ে দেবে না? শুয়ে শুয়ে রাধা শুধু এই সব ভাবে। রোজ রোজ ভাবে। ভাবে, কবে সেদিন আসবে যেদিন জামাইবাবু আর বাবাই'এর সঙ্গে চিড়িয়াখানা যাবে?

ভাবতে ভাবতেই একদিন সত্যি সত্যি সেদিন এসে গেল।

তিনজনে বাড়ির বাইরে আসতেই বাবাই পিছন ফিরে বলল, ঠাকুমা যাচ্ছি।

—যাচ্ছি বলে না; বলো, আসি।

—আসি।

—এসো!

—মা টা-টা!

—টা-টা! মিনতি এবার স্বামীকে বলেন, রাধাকে সব ভাল করে দেখিও।

কমল ঘাড় কাত করে বললেন, হ্যাঁ দেখাব। ভাল কথা, দেরি হলে চিন্তা করো না।

—আচ্ছা।

রাধা একবার শুধু হাসি মুখে পিছন ফিরে সবাইকে দেখল; মুখে কিছু বলল না। বলতে পারল না। সব সময় কি কথা বলতে ভাল লাগে?

বড় রাস্তায় এসেই কমল চিৎকার করলেন, ট্যাক্সি!

হঠাৎ রাধা মুখ ফসকে বলল, বাসে যাবেন না জামাইবাবু?

—বাসে যাতায়াত করলে কতক্ষণ আর ওখানে থাকা যাবে। তাছাড়া যা ভিড়।

এক পাশে রাধা, অন্য দিকে কমল। মাঝখানে বাবাই। বসে নয়, দাঁড়িয়ে। হঠাৎ একবার সে পিছন ফিরে বলল, বাবা, সাদা বাঘ দেখাবে ত ?

—হ্যাঁ, দেখাব।

রাধা শুনে অবাক। বাঘ আবার সাদা হয়।—বাঘ আবার সাদা হয় নাকি বাবাই সোনা ?

বাবাই চোখ দুটো বড় বড় করে বলে, বাঘের মাসী বেড়াল যদি সাদা হয়, তাহলে বাঘ হবে না কেন ?

কমল ছেলের কথা শুনে খুশি হয়ে বলেন, ঠিক বলেছ। তোমার খুব বুদ্ধি আছে ত !

বাবাই'এর বুদ্ধির তারিফ শুনে রাধাও গর্ববোধ করে। বলে, বাবাই সত্যি খুব বুদ্ধিমান। দেখবেন জামাইবাবু, বাবাই সোনা বড় হয়ে কত নাম করে।

কমল শুধু হাসেন।

ট্যাক্সি ছুটছে। বাবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু'চোখ ভরে সব কিছু দেখছে। কমল আপন মনে বসে আছেন। আর রাধা ? সে যেন স্বপ্ন দেখছে। বিভোর হয়ে স্বপ্ন দেখছে।

চিড়িয়াখানায় গিয়েও রাধা যেন স্বপ্ন দেখে। বাবাই চিৎকার করে, মাসী, দেখ, দেখ, সাদা বাঘ ! রাধা বলে, খুব সুন্দর। মুখেই কথা বলে কিন্তু মনে মনে তখনও সে বিভোর হয়ে স্বপ্ন দেখে।

—নাও রাধা, আইসক্রীম খাও।

—আমি ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি।

রাধা হেসে বলে, আপনি খাবেন না ?

—আমার আইসক্রীম ভাল লাগে না।

বাবাই বলে, খাও না মাসী, খুব সুন্দর।

রাধা ওকে জিজ্ঞেস করে, তুমি আরেকটা খাবে বাবাই সোনা ?

—না, না, তুমি খাও।

কমল বলেন, ওটা তোমার জন্যই ত এনেছি। বাবাই চাইলে পরে আবার কিনে দেব।

রাধা অত্যন্ত দ্বিধার সঙ্গে আইসক্রীম খেতে শুরু করেই বলে, শুধু শুধু আমার জন্য এত দাম দিয়ে কিনলেন কেন?

কমল হেসে বললেন, দামের চিন্তা তোমাকে করতে হবে না। একটু থেমে বললেন, রোজ রোজ কি তোমাকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে আসব? আজ যখন এসেছ, তখন যা দিচ্ছি, খেয়ে যাও।

রাধা ওর কথা শুনে চমকে ওঠে। মনে পড়ে বেশ ক'বছর আগেকার কথা। নবীন ওকে নিয়ে হৃদয়পুরের মেলায় গিয়ে এক ঠোঙা ভর্তি গজা কিনে দিয়েছিল। রাধা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, একি? এত গজা কিনলে কেন? নবীন হেসে উত্তর দিয়েছিল, রোজ রোজ কি মেলায় আসি? আজ যখন এসেছ, তখন প্রাণ ভরে খেয়ে যাও।

রাধার ছ'চোখ যেন ঝাপসা হয়ে ওঠে। মন যেন জোয়ারের টানে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। হঠাৎ যেন জামাইবাবুকে চিনতে পারে না। মনে হয়। ছোট বউ'এর ছেলে আর নবীনের সঙ্গেই···

—কী রাধা, কেমন লাগছে?

কমলের কথা কানে যেতেই রাধা যেন সংবিৎ ফিরে পায়। বলে, খুব ভাল।

বাবাই রাধার একটা হাত ধরে একটু টান দিয়ে বলল, চিড়িয়াখানায় এলে খুব মজা হয়, না মাসী?

রাধা হেসে বলল, হ্যাঁ।

—মাসী, আমরা আবার আসব, কেমন?

—হ্যাঁ, আসব।

গাছতলায় বসে বিশ্রাম করতে করতে কথাবার্তা হচ্ছিল। মাঝে মাঝে বাবাই একটু এদিক-ওদিক গেলেই রাধা ওকে ধরার জন্য তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়। কমল বললেন, না, না, ধরতে হবে না।

—যদি হারিয়ে যায় ?

—না, না, হারাবে না।

একটু পরেই আবার ওরা উঠে পড়ে। জলহস্তী, হাতি, হরিণ, উটপাখী ও আরো কত কি দেখে। বাবাই হাতির পিঠে চড়ে আনন্দে প্রায় লুটোপুটি খায়।

—কী মাসী, আমি কি পড়ে গেছি ?

—পড়বে না জানতাম কিন্তু তবু আমার খুব ভয় করছিল।

—আমি কত বার হাতি চড়েছি। আমার একটুও ভয় করে না।

—যদি হাতি ক্ষেপে যায় ?

—চিড়িয়াখানার হাতি আবার ক্ষেপে নাকি ?

রাধা ভাবে, বাবাই কত কি জানে।

চিড়িয়াখানা থেকে বেরুবার আগে বাবাই আবার আইসক্রীম খায় কিন্তু রাধা খেল না। ও চানাচুর ভাজা নিল। কমল কফি খেয়ে এলেন।

তারপর আবার একটু ঘোরাঘুরি করে ওরা বেরিয়ে পড়লেন।

বাড়িতে এসে বাবাই'এর সে কি বর্ণনা। প্রায় প্রত্যেকটা জীবজন্তু সম্পর্কে ও কিছু না কিছু বলল। মিনতির মুখখানা হাত দিয়ে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, জানো মা, আমি হাতি চড়বার সময় মাসীর কি ভয়।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ। বাবাই হাসতে হাসতে বলে, মাসী বলে, হাতি ক্ষেপে যাবে।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে রাধা চিড়িয়াখানা বেড়াবার কথাই ভাবছিল। কখন ঘুমিয়ে গেছে, তা নিজেও জানতে পারে নি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ও আবার স্বপ্ন দেখে, হৃদয়পুরের মেলায় বসে গজা খাচ্ছে। স্বপ্নে আর কিছু দেখেনি ত ?

না, ঠিক মনে পড়ছে না। দিন এগিয়ে চলে, মাস ঘুরে যায়, ঋতুর পরিবর্তন হয়। নতুন বছরও পুরানো হয়।

কত কি ঘটে গেল। বি. এ. পরীক্ষা দেবার মাস খানেকের মধ্যেই সুলেখার বিয়ে হলো। মাস ছয়েক পরে দিন সাতেক ভুগেই কমলের মা মারা গেলেন। বিমল এম. এ পরীক্ষা দিয়ে চণ্ডীগড়ে বড়দা অমলের কাছে বেড়াতে গিয়েই ভাল চাকরি পেল। বাবাইও এখন বড় হয়ে গেছে। দেখতে দেখতে কলকাতার সংসারটা ছোট্ট হয়ে গেল। সংসার চালিয়ে যায় রাধা।

প্রথম কয়েকটা মাস মিনতির খুব নিঃসঙ্গ মনে হতো। তারপর আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে গেল। সকালে স্বামী পুত্রের তদারকীতে কিছু সময় কাটে। তারপর কোনদিন রেখা এ বাড়িতে আসে, যান ওদের ওখানে। দুপুরবেলার খাওয়া-দাওয়ার আগে পরে কিছুক্ষণ রাধার সঙ্গেও গল্প করেন। গল্প-উপন্যাস পড়া আর দিবা-নিদ্রারও অভ্যাস হয়ে গেল। সন্ধ্যের পর বাবাই মাষ্টার মশায়ের কাছে পড়াশুনা করে। কমল অফিস থেকে ফিরলে কিছুক্ষণ গল্প-গুজব হাসি-ঠাট্টা হবেই। বাবাই বেশী রাত জাগতে পারে না বলে তাড়াতাড়ি খেয়েই শুয়ে পড়ে। রাত্রিতে খেতে বসে কমল আর মিনতির গল্প যেন শেষ হয় না। আগে সাহস হতো না কিন্তু এখন রাধাও মাঝে মাঝে যোগ দেয়।

রাত্রি একটু গভীর হলে একটু প্রসাধন। তারপর বেশ পরিবর্তন।

—রাধা, তোমার কাজ শেষ হলো?

—আর একটু বাকি দিদি।

—আমি শোব?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনারা শুয়ে পড়ুন।

রাধা রান্নাঘরে বসে বসেই ওদের ঘরের দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ পায়। তারপর সব কাজ শেষ করে বাথরুম যাবার সময় ওদের ঘরের আলোর আভা দেখে জানলার ঘষা কাঁচে।

এখন ঠাকুমার ঘরেই বাবাই থাকে কিন্তু রাত্রে একলা ঘুমুবার সাহস হয় না বলে রাধা ঐ ঘরেরই মেঝের শোয়।

মিনতি আর কমল সিনেমায় গেলে বা বাবাই'এর স্কুল ছুটি থাকলে রাধা তাড়াতাড়ি শুতে যায়। যাবেই। শুরু হবে দু'জনের গল্প।

—কি হলো বাবাই সোনা, আজ কথা বলছ না কেন!

—জানো মাসী, আজ আমার মনটা ভাল নেই।

—কেন?

—বিদ্যুতের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে।

—সে কি? রাধা অবাক হয়ে বলে, বিদ্যুতের মত বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া করলে কেন?

বাবাই হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে, জানো মাসী, আমি ক্লিয়ার গোল দিয়েছিলাম কিন্তু ও বলল, অফ সাইড হয়েছে।

—তুমি গোল দিলে তবুও বিদ্যুৎ…

বাবাই আপন মনেই একটু ব্যঙ্গ হাসি হেসে বলে, ওদের টীম যে তিন গোলে হারছিল।

—বিদ্যুৎ গোল না দিয়ে সত্যি অন্যায় করেছে কিন্তু খেলার মাঠের ঝগড়া খেলার মাঠেই শেষ করে দিতে হয়।

বাবাই একটু ভেবে বলে, তা ঠিক কিন্তু এখন সেধে কথা বললে যে আমার প্রেস্টিজ চলে যাবে।

শুনে রাধা হাসে। একটু ভাবে। তারপর বলে, বিদ্যুৎ ত হালুয়া খুব ভাল বাসে তাই না?

—হ্যাঁ।

—আমি কাল তোমার টিফিনে লুচি-হালুয়া দেব। একটা ছোট কৌটয় বিদ্যুতের জন্য হালুয়া দিয়ে দেব। তুমি ঐটা ওকে দিয়ে শুধু বলবে, মাসী পাঠিয়েছে।

বাবাই হাসে। বলে, তাহলে খুব মজা হবে। একটু থেমে বলে,

তাছাড়া ওর সঙ্গে কথা না বললে ক্লাসের অন্য ছেলেরা ঠিক আমাদের নিয়ে ঠাট্টা করবে।

—তুমি কিছু চিন্তা করো না। বিদ্যুৎ আমার হাতের হালুয়া পেয়ে ঝগড়া-টগড়া সব ভুলে যাবে।

বাবাই হাসতে হাসতে বলে, খাওয়ালে ও বোধহয় সেম সাইড গোল দিয়েও আমাদের টীমকে জিতিয়ে দেবে।

কোন কোনদিন বাবাই ওর সদ্য অর্জিত জ্ঞানের কথা বলে রাধাকে।

—আচ্ছা মাসী, বলতে পারো আমাদের কোথায় শীতকালেও বৃষ্টি হয়?

—শীতকালে আবার কোথায় বৃষ্টি হয়?

বাবাই হেসে বলে, দক্ষিণ ভারতে হয়।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ; দক্ষিণ ভারতের তিন দিকে যে সমুদ্র আছে। ওদের ওখানে বছরে দু বার মৌসুমী বাতাস আসে।

এই ভাবেই দিন চলে মিনতির ও রাধার। তবে হঠাৎ মাঝে মাঝে মিনতি হাঁপিয়ে ওঠে। কমলকে বলেন, হ্যাগো, আমি বরং একটা চাকরি-বাকরি নিই। বাড়িতে বসে বসে আর ভাল লাগে না।

—কিন্তু চাকরি-বাকরির কি কম ঝামেলা?

—তা ঠিক কিন্তু সারাদিন কি করব বলো? বই পড়ে আর গল্প-গুজব করে কি......

কমল ওকে বাধা দিয়ে বলেন, দশটা-পাঁচটার চাকরি করলে তুমি মারা যাবে। বরং কাছাকাছি কোন স্কুল যদি—

এক কথায় মিনতি ওর প্রস্তাব উড়িয়ে দেন—নাঃ। সারাদিন আমি বকবক করতে পারব না। এইটুকু বলেই উনি থামেন না। একটু অভিমানের কথাও বলেন, সবাই মিলে যে মাসখানেকের জন্য কোথাও ঘুরে আসব, তারও উপায় নেই। যখন বাবাই'এর স্কুল বন্ধ,

তখন তুমি কিছুতেই ছুটি পাবে না ; যখন তোমার ছুটি, তখন বাবাই-এর স্কুল খোলা। মাঝখান থেকে আমার আর কোথাও যাওয়া হয় না।

—তবু মাঝে মাঝে ত আমরা বেরোই।

—বাজে বকো না। দু'দিনের জন্য দীঘা আর একদিনের জন্য বকখালি যাওয়া না যাওয়া একই ব্যাপার।

কমল একটু চুপ করে থাকার পর বলেন, তুমি ত তোমার ভাই-বোনের কাছে মাঝে মাঝে যেতে পারো।

—পারব না কেন কিন্তু তোমরা ?

—আরে আমরা ঠিকই থাকব। রাধা ত যাচ্ছে না। তাছাড়া বাবাই এখন বেশ বড় হয়ে গেছে।

কথাটা মিনতির মন্দ লাগে না। বলেন, বেশী দিন না, দশ পনের দিনের জন্য ঘুরে এলেও মনটা একটু ভাল হয়।

স্ত্রীকে খুশি করার জন্য কমল বলেন, তোমার ভাই বোনেরা ত খুব দূরে থাকে না। তাই তুমি একলা গেলে আমি শনি-রবিবারের একদিনের ক্যাজুয়াল লিভ নিয়ে তোমাকে নিয়েও আসতে পারি।

—আর বাবাই ?

—ওকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

মিনতি এবার হেসে বলেন, তাহলে ত খুব ভাল হয়।

এবার কমল বলেন, কার কাছে যাবে বলো ; আমি টিকিটের ব্যবস্থা—

—আগে রাঁচীতেই যাব।

—ঠিক আছে। আমি টিকিট কেটেই শালাবাবুকে খবর দিয়ে দেব।

স্বামীর সঙ্গে সব কথা পাকা হয়ে গেলেও মিনতি ছেলেকে জিজ্ঞেস করেন, বাবাই আমি যদি কয়েক দিনের জন্য তোমার বড় মামার কাছে যাই, তুমি থাকতে পারবে তো ?

—বাবাও যাবে ?

—না।

—মাসী থাকবে তো ?

—হ্যাঁ।

—তবে থাকতে পারব না কেন ?

ছেলের মাথায় মুখে হাত দিতে দিতে বলেন, তুমি রাগ করবে না ?

—রাগ করব কেন ?

—তবে তুমি আর তোমার বাবা গিয়ে আমাকে নিয়ে আসবে।

—সত্যি ?

—হ্যাঁ বাবা।

—তাহলে খুব মজা হবে।

মিনতি রাধার সঙ্গেও পরামর্শ করেন—কী রাধা, তোমার কোন অসুবিধে হবে না তো ?

—বাবাই সোনাকে নিয়ে যাবেন দিদি ?

মিনতি বলেন, না, তোমার বাবাই সোনা তোমাদের কাছেই থাকবে।

রাধা হেসে বলে, বাবাই সোনা থাকলে আমার আর কিছু দরকার নেই।

মিনতি খুশী মনেই রাঁচী রওনা হন।

রাত্রে শোবার আগে কমল রাধাকে ডেকে বলেন, সকালে চা দিয়ে ডেকে দিও। নয়ত সাড়ে সাতটা-আটটার আগে আমার ঘুম ভাঙবে না।

—আমি দরজা ঠক্ ঠক্ করলেই তো আপনার ঘুম ভেঙে যাবে।

—দরজা ঠক্ ঠক্ করবে কেন ?

—আপনি দরজা না খুললে চা দেব কেমন করে ?

দরজা খোলাই থাকবে। তুমি চা দিয়ে ডেকে দিও।

—আচ্ছা।

সকালবেলায় চা আর খবরের কাগজ হাতে নিয়ে পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ায়। মুহূর্তের জন্য মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকার পর পর্দার আড়াল থেকেই ডাকে—জামাইবাবু, উঠুন। চা হয়ে গেছে।

জামাইবাবুর কানে কি সে কথা পৌঁছয়? উনি তখনও অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। রাধা আরো বার কয়েক ডাকে—জামাইবাবু, জামাইবাবু। উঠবেন না? সাড়ে ছ'টা বাজে।

না, এতবার ডাকাডাকি করেও যখন ঘুম ভাঙল না তখন মুখ নীচু করেই রাধা ঘরে ঢুকে টি-পয়'এ চা আর খবরের কাগজ রাখল। তারপর তাড়াতাড়ি একটা বিছানার চাদর এনে কমলের গায়ের উপর চাপা দিয়ে ডাকল, জামাইবাবু, চা।

রাধার এখন অনেক কাজ। তবু একটু ভাল করে জামাইবাবুকে না দেখে পারে না। বড় ভাল লাগে জামাইবাবুকে দেখতে। তারপর আবার ডাকে, জামাইবাবু, চা।

তিন চারবার ডাকার পরও যখন ঘুম ভাঙল না, তখন রাধা আলতো করে কমলের মাথায় হাত দিয়ে ডাকল, জামাইবাবু, চা।

সঙ্গে সঙ্গে উনি চোখ মেলে চেয়েই জিজ্ঞেস করলেন, ছ'টা বেজেছে?

—সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে।

কমল কাত হয়ে শুয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিতেই রাধা বেরিয়ে যায়।

রাধা রান্নাবান্না করতে করতেই এক ফাঁকে বাবাইকে তাড়া দেয়, আর দেরি করো না বাবাই সোনা; এবার বাথরুম যাও।

আবার এক ফাঁকে কমলকে দাড়ি কামাবার গরম জল দেয়। দাড়ি কামান শেষ হতে হতেই রাধা ওকে আরেক কাপ চা দিয়ে আসে।

বাবাই খেতে বসার আগে কমলকে জিজ্ঞেস করে, ক[illegible], ম[illegible] ট্রেন ক'টায় পৌঁছবে ?

—বোধহয় সাড়ে আটটায়।

—মার আজ খুব মজা।

কমল হাসেন।

খেতে বসেই বাবাই চিৎকার করে, তুমি কি করেছ মাসী ?

কমল তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করেন, কী হলো ?

—এখন এত খাওয়া যায় ?

রাধা বলল, খুব খাওয়া যায়। এখনও তোমার যথেষ্ট সময় আছে।

কমল ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলেন, রাধা আমাকে আর তোমাকে বেশী না খাইয়ে শান্তি পায় না।

রাধা হেসে বলে, আমি কাউকে বেশী খাওয়াই না।

—মাসী, মিছে কথা বলবে না।

—মিছে কথা বলব কেন ?

—তবে কি বাবা মিছে কথা বলল ?

বাবাই'এর কথায় রাধা একটু বিপদে পড়ে। একটু ভেবে বলে, না, না, মিছে কথা বলবেন কেন ! তবে ওটা ওঁর ভুল ধারণা।

—মোটেও না। তুমি সত্যি বেশী খেতে দাও।

—আচ্ছা, আজ খেয়ে নাও। কাল থেকে কম দেব।

বাবাই হেসে বলে, মাসী তুমি সব সময় বলো, কাল থেকে কম দেব কিন্তু কোনদিনই দাও না।

রাধা হাসি চেপে বলে, না বাবাই সোনা, আজকাল তোমাকে বেশী দিই না। তবে মাঝে মাঝে তাড়াহুড়োতে হয়ত দু'এক হাতা পড়ে যায়।

ওরা দু'জনে বেরিয়ে যাবার পর রাধা ঘরদোর ঠিকঠাক করার জন্য দিদি জামাইবাবুর ঘরে ঢুকেই হাসে। না হেসে পারে না। ভাবে

যাইব"ও প্রায় নবীনের মত। ঘুমুলে কাপড়-চোপড় যে কোথায় ", তার ঠিক ঠিকানা নেই। দেখে লজ্জাও লাগছিল, আবার ভান শিশুর মত এমন অসহায় হয়ে ঘুমুচ্ছিলেন যে মায়াও করছিল।

বিছানা ঠিকঠাক করতে করতে রাধা যেন চোখের সামনে ভোর-বেলায় জামাইবাবুকে দেখতে পায়। একটু সলজ্জ শিহরণ বোধ করে মনে, শরীরে। সত্যি, দিদি কত ভাগ্যবতী!

রাধা আপন মনে সংসারের কাজ করে যায়। একবার এক মুহূর্তের জন্যও মনে হয় না, সে এ সংসারের কেউ না, সে দাসী মাত্র। বরং মনে হয়, এ সংসার ওর নিজেরই। জামাইবাবু টাকা রোজগার করেন ঠিকই কিন্তু বাজার-হাট ঘর সংসারের সবকিছুই ও ঠিক করে। কবে মাছ হবে আর কবে চিকেন, তা কোনদিন দিদি বলেন না। বাবাই কি খাবে পরবে, তাও দিদি বলেন? না! দিদি জানেন, বাবাই'এর খুঁটিনাটি সবকিছু রাধা দেখবে। অধিকাংশ মেয়েই নিজের সংসার অন্যের উপর ছেড়ে দেয় না, দিতে পারে না। অনেক বাড়িতেই রান্নাবান্না কাজ-কর্মের লোক আছে কিন্তু বাড়ির গিন্নী তাদের উপর খবরদারি করেন না, এমন নজীর তো চোখে পড়ে না। সত্যি, দিদির মত মানুষ হয় না। এই ত রাঁচী যাবার আগে দিদি হাসতে হাসতে শুধু বললেন, রাধা, তুমি তোমার বাবাই সোনা আর জামাইবাবুকে নিয়ে সংসার করো। আমি আমার দাদার কাছে চললাম।

রাধাও হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছিল, আমার সংসার কি শুধু বাবাই সোনা আর জামাইবাবুকে নিয়ে? আমার দিদি কি আমার সংসারে থাকেন না?

মিনতি প্রসন্ন মুখে বলেছিলেন, হ্যাঁ রাধা, তোমার দিদিও তোমার সংসারেই থাকেন।

ঠিকে ঝি আসে, চলে যায়। রাধা বাবাই'এর ঘর পরিষ্কার করতে করতে টফির বড় কৌটোটা দেখেই হাসে। রাধা পড়াশুনা করে নি

কিন্তু ও জানে, কৌটোর গায়ে যে কাগজটা লাগান আছে, তাতে লেখা আছে মাসীর ব্যাঙ্ক।

এ বাড়িতে আসার পর রাধা দু'এক মাস নিজে হাতে মাইনে নিয়েছিল কিন্তু দু' পাঁচ টাকার বেশী খরচ করার সুযোগ পায় নি। তারপর যখন মিনতি ওকে মাইনে দিতে এলেন, তখন রাধা বলেছিল, দিদি, আমার তো টাকার দরকার নেই। ও টাকা আপনার কাছেই রেখে দিন। বছর খানেক মিনতির কাছেই টাকা জমা ছিল কিন্তু তারপর হঠাৎ একদিন উনি সব টাকা রাধার হাতে জোর করে দিতেই মাসীর ব্যাঙ্কের জন্ম হলো। ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেকটর থেকে শুরু করে ক্লার্কও বাবাই সোনা। বাবাই একটা ছোট্ট নোট বইতে টাকার হিসেব লিখে রাখে। মাঝে মাঝে হিসেবের খাতার সঙ্গে কৌটোর টাকা মিলিয়ে দেখে হাসতে হাসতে বলে, মাসী, তুমি বেশ বড়লোক।

—তাই নাকি বাবাই সোনা?

গম্ভীর হয়ে নোট বই দেখতে দেখতে বলে, এ বছরে তুমি আমার জন্য মোট তিন শ' একুশ টাকা ব্যয় করেছ। তবুও তোমার ব্যাঙ্কে এক হাজার পাঁচ শ' পঞ্চাশ টাকা পড়ে আছে।

—থাক। আমার আরো অনেক টাকা দরকার।

—অনেক টাকা দিয়ে তুমি কি করবে?

রাধা হাসতে হাসতে বলল, সে তোমাকে বলব কেন?

—আমাকেও বলবে না?

—না, সে কথা শুধু তোমাকে বলব না।

কয়েক মাস আগে রাত্রে খাবার টেবিলে বসে হঠাৎ কথায় কথায় মিনতি ওকে জিজ্ঞেস করেছিল, রাধা, এই টাকা দিয়ে তুমি নিজের জন্য কিছু কর না কেন?

আমার সব কিছুই তো আপনারা দিচ্ছেন। আমার ত খরচ করার দরকার হয় না।

—তবে টাকা জমাচ্ছ কেন ?

—বাবাই সোনা বিলেত যাবে, বাবাই সোনা বিয়ে করবে, তখন কি আমার কম টাকার দরকার ?

ওর কথা শুনে কমল অবাক বিস্মিয়ে বলেছিলেন, রাধা, তুমি সত্যি বিচিত্র মেয়ে।

মিনতি হাসতে হাসতে বলেন, আচ্ছা রাধা, তোমার বাবাই সোনা বিলেত গেলে তুমি এখানে থাকতে পারবে.?

—আপনারা যদি পারেন তাহলে আমি পারব না কেন ?

কমল একটু হেসে বললেন, রাধা অত স্বপ্ন দেখ না। পরে হয়ত—

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই রাধা বলল, ওকে নিয়ে স্বপ্ন দেখব না তো কাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখব জামাইবাবু ? বাবাই সোনা ছাড়া আমার আর কে আছে এ পৃথিবীতে ?

বাবাই'এর ঘরে এলেই রাধা কেমন আনমনা হয়ে যায়। ওর বইখাতা জামাকাপড় বিছানাপত্তর নাড়াচাড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে যে কত সময় কেটে যায়, তা ও নিজেই বুঝতে পারে না। হঠাৎ দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে তিনটে বাজতেই ও দৌড়ে স্নান করতে যায়।

বিকেলে বাবাই ফিরে আসে। সন্ধ্যেয় কমল ফিরে আসেন। মাষ্টার মশাই চলে যাবার পরই বাবাই খেয়ে শুয়ে পড়ে। ঘণ্টা খানেক পর কমল খেয়ে নেন। রান্নাঘরের কাজ সেরে রাধাও খেয়ে নেয়। জামাইবাবুর ঘরে খাবার জল রেখে দরজা-টরজা দেখেশুনে রাধাও শুতে যায়। বাবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। রাধা কিছুক্ষণ ওর মাথায় হাত দিয়ে নিজেও শুয়ে পড়ে।

পাঁচটা বাজতে না বাজতেই রাধার ঘুম ভেঙে যায়। বাবাইকে একবার ভাল করে দেখে নিয়ে বাথরুমে যায়। তারপর শুরু করে সংসারের কাজকর্ম। সাড়ে ছ'টা নাগাদ চা আর খবরের কাগজ নিয়ে

জামাইবাবুর ঘরে ঢুকে আবার থমকে দাঁড়ায়। লজ্জা পায়। হয়ত এক মুহূর্তের জন্য ভালও লাগে। না, আর দেরি করে না। কমলের গায়ে চাদর দিয়েই ডাকে, জামাইবাবু, উঠুন।

না, আজও তিন-চারবার ডাকাডাকি করেও ওর ঘুম ভাঙে না শেষ পর্যন্ত রাধা ওর মাথায় হাত দিয়ে ডাকে, জামাইবাবু, উঠু চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

হ্যাঁ, এবার কমলের ঘুম ভেঙে যায়। একটু পরে বাবাই'এর ঘুম ভাঙে।

দিন এগিয়ে চলে সমান গতিতে। দিনের পর দিনও গড়িয়ে যায়। মিনতি ফিরে আসেন।

কমল অফিস যাবার সময় মিনতি বললেন, আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। তোমাকে প্রণাম করে তোমার হাতে ফল মূল না দিলে ত রাধা জল খেতে পারবে না।

—আজ শিবরাত্রি নাকি?

—হ্যাঁ।

সন্ধ্যের পর রাধা ফলমূল মিষ্টির থালা পাশে রেখে কমলকে প্রণাম করতেই উনি ওর মাথায় হাত দিয়ে মনে মনে বলেন, তু... সত্যিই রাধা। তাইতো নিজের সংসারকে ভালবাসার সুযোগ পে... না। অন্যের ভালবাসাতেই তুমি বিভোর। সামনের জন্মে যে... তোমার নিজের সংসারকেই ভালবাসতে পারো।

আর রাধা? সে প্রণাম করে মনে মনে কি প্রার্থনা করল? এমন স্বামী, এমন দিদি, এমন পুত্র কি সামনের জন্মেও সে পাবে না? পেতে পারে না? দাসী-বাঁদীর স্বপ্ন কি পরের জন্মেও পূর্ণ হবে না?